কাব্য সাহিত্যের ধারা

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কাব্য-সাহিত্যের ধারা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

প্রখ্যাত কবি, কথাশিল্পী ও সমালোচক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করকমলেষু

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই

পল্লীব্যথা
মধুমালতী
রক্তরেখা
আহিতাগ্নি
মনোমুকুর
মডার্ণ কবিতা
অনুরাধা
অতসী
জলন্ত তলোয়ার
কাব্য-সঞ্চয়

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

খ্রীষ্টানুসরণ (Imitation of Christ)

বেঁটে বক্কেশ্বর
কুড়ের বাদসা
নিদ্রাবতী রাজকন্যা

বন্দনা

ভূমিকা

বর্তমানে বাংলা কাব্য, বিশেষতঃ আধুনিক বাংলা কাব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনার যে প্রয়োজন আছে, আশা করি, কেও একথা অস্বীকার করেন না বরং অনেকে একথাও বলে থাকেন যে আজ পাঠক-মনে কাব্যের মূল্যমান সম্বন্ধে যে পরস্পর-বিরোধী ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার ন্যায়সিদ্ধ মীমাংসার চেষ্টা অবিলম্বে সুরু হওয়া উচিত। কাব্যের আদর্শ ও শিল্পাচার নিয়েও আজ সংশয়ের অবধি নেই। এমন কি বাংলা কাব্যের বিচার-পদ্ধতিতেও আজ দলগত মতভেদ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কাব্যের আলোচনা, সাহিত্যের সামগ্রিক গতি-প্রকৃতির পটভূমিতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই প্রসঙ্গে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মনে রাখা কর্তব্য। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে চিত্তের যে স্থৈর্য, মানস-প্রকৃতির যে ঐশ্বর্য লাভ করি, তা' ঐতিহ্যে স্থিতি লাভ করে আমাদের জীবনে; একথা অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে জীবন-চেতনাকে অস্বীকার করা। একালের বিচার অবশ্য তার পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশ ও মননশীলতাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়, কিন্তু কালের পরিবর্তন স্রোতে অতীতের আদর্শবোধ, গ্রহণ-শক্তি ও ভাব-প্রবণতা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না—যদিও পরিবর্তনের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় মানুষের চিন্তাধারায়, বাক্যে ও কর্মে। তাই আমাদের বর্তমান আলোচনায় কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ ও স্থিতিভূমি নির্ণয়, তত্ত্ব-সমীক্ষা ও রস-বিচারের যথার্থ মূল্য কি, তার যাচাই হবে—শুধু তার অতীত নয়, বর্তমানও নয়, উভয় কালের কষ্টিপাথরে।

একাধিক ক্ষেত্রে আমরা পাশ্চাত্য মনীষীদের উক্তি উদ্ধৃত করেছি—আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে। তার কারণ এই যে, আমাদের ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে তার মূলগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট আভাস পাই আমরা তাঁদের চিন্তা, ভাবুকতা ও উপলব্ধির মধ্যে।

যাঁরা আমাদের গুরুস্থানীয় তাঁদের সাহিত্যকর্মের গুণসম্পন্নতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ যোগ্যতার পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ। আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা তাই আমাদের বার বার মনে হয়েছে। তিনি আমাদের

নূতন আশা ও প্রত্যয়ের বাণী শুনিয়েছেন, মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টির পথ প্রদর্শন করেছেন, নব যুগের জীবন-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এ যুগের কাব্যা-দর্শের প্রবর্তকও তিনি। আবার একথাও নির্ভয়ে বলা যায় যে আমাদের কালের প্রথম ও প্রধান আধুনিক কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ—তিনি নবযুগের নূতন জীবন-বোধের উদ্বোধন করেছেন, নূতন পথ-পরিক্রমার পাথেয় আমরা তাঁরই মুক্ত হস্তের দান বলে গ্রহণ করেছি—তিনিই আমাদের যাত্রাপত্রের পথিকৃৎ।

সমকালীন যে সকল কবি 'রবি-পরিমণ্ডল'এ অবস্থান করেও আপন আপন স্বকীয়তায় উৎকৃষ্ট রচনা-সম্ভারে সর্বকালের উপভোগ্য আনন্দ-রস পরিবেশন করেছেন বা এখনও করছেন, তাঁরা বাংলা দেশের খ্যাতিমান কবি-গোষ্টির অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছেন। অতএব তাঁদের সম্পর্কে পৃথক আলোচনার অবশ্যই প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে কিন্তু সেটা বর্তমান গ্রন্থের বিষয়-বহির্ভূত।

আমাদের বিশ্বাস, তথাকথিত "আধুনিকতা"র মোহ থেকে বাংলা কাব্যের মুক্তি আসন্ন না হলেও একেবারে সুদূরপরাহত নয়। বিশ্বাস করি বলেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা চিরস্বীকৃত এবং ন্যায়সিদ্ধ কাব্যতত্ত্বের নিরীখে আধুনিক কাব্যপ্রচেষ্টাকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছি। বাংলা কাব্য সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে ভবিষ্যতেও হবে। এ সম্পর্কে আমাদের কথাই যে শেষ কথা তা' নাও হতে পারে। তার অপক্ষপাত বিচারের ভার রইল কাব্যরসিকদের উপর। আমাদের বক্তব্যে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকাও অসম্ভব নয়। তবে আমরা মনে করি যে, কাব্য-জিজ্ঞাসার দিক থেকে আমাদের এ আলোচনা নিরর্থক নয়—অসার্থকও নয়।

কবি-কর্মের পুরাতন ও নূতন আদর্শের ব্যাখ্যান, কালধর্মের প্রভাব ও প্রেরণার সন্ধান এবং শিল্পাচারের আলোচনা প্রভৃতি বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষে সহায়তা করবে—এই বিশ্বাসেই বাংলা "কাব্য-সাহিত্যের ধারা"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল—দ্বিতীয় খণ্ড অদূর ভবিষ্যতেই প্রকাশিত হবে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক "মিত্র ও ঘোষ" এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ভার নিয়ে গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন-সায়র
১৬, বিপিন পাল রোড
কলিকাতা-২৬

সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ

সাহিত্য—ধর্মমতের আলেখ্য

"যে জাতির যে ধর্ম,—সেই জাতির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেই ধর্মের অনুকূল হবেই। এমন কি ভাষার প্রত্যেক শব্দ, রচনাভঙ্গী, অলঙ্কার সমাবেশ ও রসের বিকাশ সেই ধর্মের অনুগামী বা প্রতিধ্বনি। খৃষ্টধর্মের ছাপ আমরা দেখতে পাই ইংরাজি ভাষায়। ইংরাজি সাহিত্যের প্রত্যেক গ্রন্থে খৃষ্টানী মত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। কারণ সাহিত্যকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা যায় না। যে কালের যে সাহিত্য, সেই কালের সমাজ-ধর্ম ও সাধন-ধর্ম সেই সাহিত্যে ওতপ্রোত ভাব জড়িত থাকবেই। সাহিত্য জাতি-বিশেষের এক-একটা যুগের ইতিহাস, ধর্মমতের আলেখ্য-স্বরূপ।"—এই প্রণিধানযোগ্য কথাগুলি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে ফরাসী সাহিত্যের সেবক সুপণ্ডিত মসিঁয়ে ফাজি (M. Faguet) ব্যালজাকের সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন। স্বীয় মতবাদ সমর্থনে মসিঁয়ে ফাজি আরও পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন যে ইঙ্গারসোলের (Ingersoll) সহিত রেভারেণ্ড ওয়ার্ড বীচারের (Rev. Ward Beecher) বাইবেলের ধর্মমত নিয়ে আমেরিকায় প্রবল তর্ক-বিতর্ক হয়। ইঙ্গারসোল ছিলেন নাস্তিক—তিনি খৃষ্টধর্মের মতবাদ, যুক্তি-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি খণ্ডন করেন; ফলে সমগ্র সভ্য জগতে তখন একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত হয়। সেই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে রেভাঃ বীচার একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। তিনি বলেন,—"প্রত্যেক ভাষার ও সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে। * * * ইংরাজি ভাষার ও সাহিত্যের প্রত্যেক স্তরে খৃষ্টান ধর্মমত পরিব্যাপ্ত। বিশেষতঃ আধুনিক ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য প্রটেষ্টাণ্ট (Protestant) ধর্মমতের দ্বারা যেন স্নিগ্ধ হয়ে আছে। তুমি ইঙ্গারসোল, যে ইংরাজি ভাষার সাহায্যে খৃষ্টধর্মের খণ্ডন করছ, সেই ইংরাজি ভাষায় খৃষ্টানী মত ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করছে।"

ফরাসী সাহিত্য প্রায় পাঁচ শত বৎসরের খৃষ্টীয় সভ্যতার ফল, সহস্র বৎসরব্যাপী খৃষ্টীয় ধর্মমত সাধনের পরিণতির স্বরূপ, সে ফরাসী ভাষার মজ্জাগত খৃষ্টানী ভাব ভল্‌টেয়ার রুসোর জ্বালাময়ী রচনাতেও একেবারে মুছে যায় নি। মসিঁয়ে ফাজির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সমাজ ও সাহিত্য। তিনি আলোচনায় এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, সাহিত্য সমাজ-সচেতন না হলে, ধর্মানুগ না হলে বাঁচতে পারে না এবং তার দ্বারা জাতির ও সম্যাজের মননশীলতার সম্যক পরিচয় লাভও ঘটে না। মসিঁয়ে ফাজি ঠিকই বলেছেন। কোনও দেশে এক দিনে ভাষার স্মৃষ্টি হয় না, যুগ-যুগান্তের চেষ্টায় একটি ভাষা পূর্ণাঙ্গ হয়ে ফুটে ওঠে ; যুগ-যুগান্তরের মতবাদ, ভাব ও ধ্যান-ধারণা ভাষার স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে থাকে ; সে সকল স্তর-বিন্যস্ত ভাবরাশিকে একটা বিপ্লবের ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফরাসী বিপ্লব ধ্বংসের বিপ্লব হলেও ভল্‌টেয়ার রুসোর মত অসামান্য প্রতিভাশালী উগ্র সাহিত্যিকও ফরাসী সাহিত্যকে তার ধর্মের বেদী থেকে নামাতে পারেন নি। তাই নেপোলিয়ন সম্রাট পদবী পেলে আবার রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই নেপোলিয়নের পতনের পর ফরাসী রাষ্ট্রপতিগণ রোমান কাথলিক ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেননি। বিপ্লবের এই প্রতিক্রিয়ার ফলে বালজাক, ভিক্টর হিউগো, এমীল জোলার উদ্ভব হয়েছিল।

এ সম্পর্কে মসিঁয়ে ফাজি অতি চমৎকার একটি উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"একটি বড় আয়নার উপর কোনও দুষ্ট ছেলে একটি ঢেলা ছুড়ে মারলে কাচখানি ফেটে শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় অথচ ফ্রেমের বন্ধনীর প্রভাবে সব কাচখণ্ডগুলি ঝরে পড়ে না—সেই ভাঙ্গা আয়নার সম্মুখে দাঁড়ালে কিম্ভুতকিমাকার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ফরাসী বিপ্লবে ভগ্ন ফরাসী সমাজের সনাতন আয়নাখানি চৌচির হয়ে গিয়েছিল, তাতে ফরাসী সমাজের যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল বালজাক তারই আলেখ্য অপূর্ব ভাষায় লিখে গেছেন। সে আলেখ্যতে ধর্ম আছে, অধর্ম আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে,—উৎকট উদ্ভট সবই আছে। কিন্তু সে সকলই জাতির অতীত গৌরবের ফ্রেমে আঁটা—ফরাসী ভাষার ও সাহিত্যের বন্ধনী-সংলগ্ন। বালজাক পরম্পরার কথা বিস্মৃত হননি। বালজাক অতীতকে বর্তমানের সম্পর্কশূন্য করে দেখাননি।

তিনি বলেছেন—To look back is to look beyond—পিছন ফিরে তাকানর অর্থই হচ্ছে নজরের বাইরেটাও দেখা।—যে অতীতের চিন্তা করে, তাকে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতেই হবে। বালজাক অতীতের আলেখ্য চিত্রিত করছেন, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করতে ভোলেননি। অতএব বালজাক ধর্মহীন নন।

বালজাক সম্বন্ধে মসিঁয়ে ফাজির মন্তব্যকে এমন বিশদ ভাবে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য এই যে, সাহিত্যে ধর্মের স্থান নেই বা প্রভাব নেই, অথবা সাহিত্যিক ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে শুধু রচনার উৎকর্ষ সাধন করবে, আর্টই একমাত্র সাহিত্যের বিচার করবে বস্তুতান্ত্রিকতা নয়, সাহিত্যের যদি কোনও ধর্ম থাকে তবে সে হচ্ছে একমাত্র আর্ট—এবং আর্টের বিকাশ হয় রসসৃষ্টিতে। রূপায়নে শিল্পানুভূতি কতখানি চরিতার্থতা লাভ করল, রচনা কত দূর রসোত্তীর্ণ হল তাই সাহিত্যের জাতি বিচারের বা উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি—এই প্রকার অভিমতের বশবর্তী হয়ে অনেকে বালজাকের সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে বলে থাকেন যে, রস ও রূপায়নের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, ধর্মের ধারও তিনি ধারেন নি, নীতি বা চতুষ্কোণী কোনও রীতিপদ্ধতিকে তিনি আমোল দেননি। এ অভিমত ঠিক নয়। অর্থাৎ আমাদের বক্তব্য এই যে, বালজাক সাহিত্য রচনায় নাস্তিক্য বুদ্ধির দ্বারা অভিভূত হননি—তাঁর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ধর্ম বা নীতিজ্ঞান-বিগর্হিত নয়, পাপ বা গর্হিত কর্মের নিরাবরণ প্রকাশের মধ্যেও প্রকৃত শিল্পী ও রসিকের ধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। যে দেশেরই সাহিত্য হোক না কেন, তা মূল আদর্শে ও উপাদানে, রূপে ও রীতিতে অন্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারে না। পারে না বলেই আজ বৈদেশিক সাহিত্যের আলোচনার একটি বিশেষ সার্থকতা আমরা উপলব্ধি করছি—এই পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের বিচার ন্যায়সঙ্গত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বালজাক্ নিজেই বলেছেন, "যেমন সূত্রের সাহায্যে মালা গাঁথা যায়, তেমনই ভাষার সাহায্যে যুগ-যুগের সাহিত্যকে গেঁথে রাখা যায়। ভাষা সূত্র, সাহিত্য ফুল, এ সূত্র ছিন্ন হয় না, এ ফুল শুকায় না। তিনিই বলেছেন যে, "ফরাসী বিপ্লব ফরাসী জাতির পারম্পর্যের ছেদ নয়—গতির বিরাম নয়।

মালায় জোট ধরেছিল এটা সেই জোট খুলবার চেষ্টা মাত্র। * * আমি জাতিতে ফরাসী, বিস্মৃতির আশ্রয় নেব কেন? * * বালক যেমন চকলেট চাটে, তেমনি করে অতীত স্মৃতিকে চাটব, ধীরে ধীরে, রসিয়ে মজিয়ে লেহন করব। কেবলই কি দর্প-দম্ভের, শ্লাঘা-স্পর্দ্ধার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়? লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, সঙ্কোচের বিষয় নিয়ে নাড়া-চাড়া করিলেই বা ক্ষতি কি? ঢাকলেই পাপ, লুকালেই শয়তান দেখা দেয়, যেখানে প্রচ্ছন্নতা, সেইখানেই শয়তানের রাজ্য বিস্তৃত রয়েছে। সে কথা আমি ভুলব কেন?" যিনি এমন কথা বলতে পারেন তিনি—"সমাজ-ধর্ম্মহীন" হতে পারেন না। তিনি ভাষার ধর্ম্ম নষ্ট করেন নি, তিনি জাতির ধাতু ভোলেন নি।

সাহিত্যে ধর্মপারম্পর্য

মসিঁয়ে ফাজি নিজের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর প্রবন্ধে বালজাক ছাড়া এমীল জোলা ও ভিক্টর হিউগো সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি এ বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, এমীল জোলা বালজাকের এ কথার সার্থকতা বুঝেছিলেন। তাই তিনি সমাজকে অনাবৃত করে দেখিয়েছিলেন, কিন্তু উলঙ্গতার লাম্পট্যে বিভোর হয়ে সাহিত্য বা সাহিত্যিকের ধর্ম ভোলেন নি। সমাজকে প্রাণের প্রাণ বলে জেনে, সভ্যতার আবরণে গা ঢাকা দিয়ে সে সমাজের সর্বাঙ্গে কেমন ভাবে শয়তান অধিকার বিস্তার করেছে, তাই সকলকে বুঝাবার জন্য জোলা ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের আবরণ উন্মোচন করে পাঠকের সম্মুখে ধরেছেন। কিন্তু জোলা তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে ধর্মের প্রভাব এড়াতে পারেননি। জোলার সাহিত্যে তাই ইউরোপ দেখল বিকট বাস্তবতার মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। সে ধর্মকে মসিঁয়ে ফাজি বলেছেন Crystalised French Manhood—"স্ফটিকীভূত (দানাবাঁধা) ফরাসী মানবতা।" সে দানাবাঁধার কাজে অতীতের ইতিহাস স্তরে স্তরে উপাদান জুগিয়েছে; সহস্র বৎসরের ফরাসী সভ্যতা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে স্ফটিকাকারে স্থায়ী হয়ে আছে। তাই জোলা বলেছেন—"মানুষের লেখা ও বিধাতার লিপি একই, দুটোই মুছে ফেলা যায় না। বংশের পর বংশ এসেছে, বংশে বংশে যুগে যুগে কত লেখাই লিখিত হয়েছে, বংশানুক্রমের

প্রভাবে সে লেখা অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় যেন গেঁথে গিয়েছে জেঁকে বসেছে। সে প্রকৃতির লেখা মুছা যায় না।” জোলা তাই প্রকৃতির সংস্কারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাঁর লজ্জা নেই, ক্ষোভ নেই কেন না তিনি যেন শয়তানকে আলোকের মাঝখানে টেনে আনতে চেয়েছেন। কাজেই বলতে হয়, এমীল জোলা ধর্মের অপহ্নব ঘটাননি, ভাষা ও সাহিত্যের ধর্ম-পারম্পর্য বিস্মৃত হন নি।

ভিক্‌টর হিউগোর পক্ষে এতটা কৈফিয়ৎ প্রয়োজন হবে না। মসিঁয়ে ফাজি তাঁকে “ইউরোপের পুরাণকার” বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন যে, ভিক্‌টর হিউগো নভেল বা উপন্যাস লিখেন নি,—বস্তুবাদের দিক থেকে ধরতে গেলে তিনি সমাজের উপাখ্যান রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি কেবল পাঠকের চিত্ত-বিনোদনের জন্য লিখিত নয়, প্রধানতঃ পাঠক চিত্তে ভাবোন্মেষের জন্য লিখিত। সে ভাবোন্মেষ অতীতের সহিত পারম্পর্য নষ্ট করে না, সে ভাবোন্মেষ পাঠককে আত্মহারা করে দেয় না—অতীতকে মুছে ফেলে দিয়ে বর্তমানকে উন্নত করে তোলে না। হিউগো সমাজের সকল স্তরের বর্ণনা করতে সঙ্কোচ বোধ করেননি, ইতরতা ও হীনতা, পশুত্ব ও পিশাচত্ব অঙ্কিত করতে লজ্জিত হননি; হিউগো দারিদ্র্যের বিকটতা দেখিয়েছেন, ঐশ্বর্যের পৈশাচিক ভাবও দেখিয়েছেন। কিন্তু পুরাণকারের মতো ইতিহাসের সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এমন লোকের হাতে ধর্ম ও মানবতা শতদলের মত ফুটে উঠেছে। হিউগো সমাজের মিথ্যা ছবি দেখান নি, দর্শকের দেখার সুবিধার জন্য নিজের হাতের আয়নার পরিবর্তন করেন নি। তিনি বলেছেন—“দেখ, সোজা হয়ে অপলক চোখে দেখ, দুই দিকই দেখ। সব দেখে নিজের দিকেও তাকাও। যদি আমার আলেখ্য-পরম্পরায় তোমার মতো কাকেও চিনতে পেরে থাক, তা হলে আমার কথা শোন। নাহলে তোমার লাভ চিত্ত-বিনোদন, আমার লাভ ফিরিওয়ালার ছবি দেখানর সুখ।” মসিঁয়ে ফাজি বলেছেন—এটা ধর্মযাজকের কথা—পুরাণকার ঋষির কথা। ইউরোপের সাহিত্যে ইতঃপূর্ব্বে এমন কথা আর কেও বলেন নি।

মসিঁয়ে ফাজি এই ভাবে তিন জন যুগ-প্রবর্ত্তক ফরাসী লেখকের সাহিত্য বিশ্লেষণ করে তিনটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন—

(১) যা' জাতির সাহিত্য, তা' জাতির মেদ-মজ্জার সহিত জড়িত ; তা' জাতির সকল স্তরে সঞ্চারিত,—উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত সকল লোকেই পরিব্যাপ্ত।

(২) যা' জাতির সাহিত্য, তা' জাতির অতীত-পারম্পর্যের সহিত সংবদ্ধ —মাল্য-গ্রথিত পুষ্পশ্রেণী তুল্য।

(৩) যা' জাতির সাহিত্য, তা' জাতির সমাজ-ধর্মবর্জ্জিত হতে পারে না ; তা' জাতির ভাষানিহিত ধর্মকে উল্লঙ্ঘন ক'রতে পারে না।

একথা সত্য যে, ধর্মবিপ্লব না ঘটলে ভাষার প্রকৃতি বা রূপের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। এমন কি, ধর্মবিপ্লব সত্ত্বেও এক একটি শব্দে, ভাষার এক একটি বাচন-ভঙ্গীতে অতীত যুগের অনেক বিস্মৃত কথা লুকিয়ে থাকে। খৃষ্টান ধর্ম এতাবৎকাল ইউরোপে প্রচলিত থাকলেও আজও ইউরোপের সকল সভ্য দেশের ভাষায় গ্রীস ও রোমের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। পারম্পর্যের চিহ্ন একেবারে মুছে ফেলবার নয়। অতএব দেখা গেল ভাষা কেবল সাহিত্যের বাহক নয়, তার সর্বাঙ্গে জাতির পরিচয়চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। ভাষা সমাজের অভিব্যঞ্জনা ; ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আত্মরক্ষা করে চলে। ধর্মের উপাদানে সাহিত্যের সৃষ্টি—আবার সমাজকে আশ্রয় করে ধর্ম আপনাকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে চলে। কাজেই বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকগণ জাতির সমাজ ও ধর্মের উপর সেই জাতির ইতিহাস রচনা করে চলেন এবং সেই বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের উপরই আজ বিশ্বমানবের ইতিহাস গড়ে উঠেছে—সেখানে অতীতের সাথে বর্তমানের এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতায় বিশ্বসাহিত্য অমর হয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি আলোচনার কথা মনে পড়ছে। এই আলোচনাটি করেছিলেন আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হর্টন (Prof. Horton)—উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সাহিত্যের উপাদান (The Elements of Literature) শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে তিনি কিভাবে সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবপর হয়ে থাকে তার কারণ বিশ্লেষণ করেন। তিনি সাহিত্যের উদ্ভব সম্পর্কে যে কয়টি কারণ নির্দেশ করেছিলেন, সেগুলি এই :—

(১) ধর্ম না থাকলে সাহিত্য হয় না। পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির সাহিত্যের বনিয়াদ ধর্ম। সকল দেশের সকল সাহিত্যের মূলে ধর্ম আছেই।

(২) সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটে Mysticism এবং Transcendentalism অর্থাৎ অজ্ঞেয়তাবাদে ও পরাতত্ত্ববাদে। এমন কি, প্রণয়ের কথাতেও তখন অজ্ঞেয়তাবাদ ও পরাতত্ত্ববাদ যেন জড়ান মাখান থাকে।

(৩) বিলাস ও দেহাত্মবাদ (Materialism) প্রবল হলে সে সাহিত্যের অবনতি ঘটে। শুধু দেহাত্মবাদই যদি প্রবল হয়, তাহলে সে জাতির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্টি হয় না। দেহাত্মবাদের প্রভাব অতিক্রম করতে না পারলে খাঁটি কবিও নিম্নস্তরের কাব্য লিখে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন,—উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনার কাজ তখন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

(৪) সাহিত্যে সংরক্ষণের (conservation) চেষ্টা হলেই বুঝতে হবে যে সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। যখন নূতন সৃষ্টি হয় তখন ঘর গোছাবার অবসর থাকে না। মিল্টন-বেকনের সময় ক'খানা Encyclopædia বা বিশ্ব কোষের সৃষ্টি হয়েছিল? এখন সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে একটা করে বিশ্বকোষের সৃষ্টি হচ্ছে। এর তাৎপর্য্য এই, এখন আর নূতন সৃষ্টি হচ্ছে না, যা' পুরাতন আছে, তা' সামলাবার কাল এসেছে।

(৫) সাহিত্যে বিভীষিকা, সাহিত্যের অবনতির একটি প্রধান কারণ। বাসনা সাহিত্যের জননী। আশা ও আকাঙ্ক্ষা থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি। উৎকর্ষ সাধনের প্রেরণা থেকেই তার পুষ্টিসাধন। যত দিন মানুষ ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় যবনিকা ভেদ করতে চেষ্টা করবে, ততদিন সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হবে। কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ ইহকাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, পরকালের ভাবনা ভাবতে গেলেই আতঙ্কে শিউরে উঠবে, সেই দিন থেকেই তার সাহিত্যের অবনতি ঘটতে থাকবে।

সাহিত্যে বিভীষিকা

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও কি সেই বিভীষিকার ভাব প্রবেশ করেছে? গত কয় বৎসর ধরে সাহিত্যে বহুবিধ অনাসৃষ্টির জন্য সত্যকার প্রতিভারও অপচয় ঘটেছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যের মত জীবনেরও প্রধান বিভীষিকা মৃত্যু। ধর্ম সাহিত্যের প্রবল শত্রু এই মৃত্যু ভয়কে হ্রাস করে দেয়, মৃত্যুর পরপারে একটি ভাব জগতের সৃষ্টি ক'রে মৃত্যুকে নব জীবনের দ্বারস্বরূপ ব'লে ধারণা করাতে মৃত্যু-বিভীষিকা উপেক্ষণীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ যখন দৈহিক সুখের প্রত্যাশী হয়, ভোগায়তন দেহের পুষ্টিতে বিব্রত হয়ে মনে মনে উচ্চ বৃত্তিকে অবহেলা করে, ও অনাগতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে, তখনই সেই বিভীষিকা তাকে নানা দিক্ থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সাহিত্যের এই বিভীষিকা প্রতিভার পরম শত্রু। যখন প্রতিভার বিকাশ এই ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। নূতন সৃষ্টি না থাকলে সাহিত্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রে অচলায়তনের কঠিন প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রতিভার নবোদ্গত অঙ্কুর আলো-বাতাসহীন আবহাওয়ায় সঙ্কুচিত হয়ে অকালে লয়প্রাপ্ত হয়। এ উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়।

আমাদের সাহিত্যে আজকাল নূতন প্রতিভার একাধিক স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে না; উপরোক্ত কারণেই যে তা দেখা যাচ্ছে না তা নয়;—এটাও অনেকের মত। তাঁরা বলেন যে, বাংলা সাহিত্যে আকাল এসেছে; ইংরেজি সাহিত্যের এক জন বিখ্যাত সমালোচক যার আখ্যা দিয়েছেন 'Periodicity'—তারই প্রভাবে না কি আজকাল প্রতিভার বিকাশ হচ্ছে না। হতেও পারে; হয়ত সেই জন্যই আমরা দেখছি 'মাঝারি' (Mediocre) সাহিত্যিকের দল অনুজ্জ্বল সাহিত্য-দীপালীর উৎসবে মেতে আছেন। এই স্তিমিত আলোকে জীবনের দুর্জ্জেয় বা অজ্ঞেয় যবনিকার অন্তরালে যে বস্তু আছে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁরা আজ একান্ত 'আটপৌরে' ঘটনাকে, জৈব প্রেরণার অতি সাধারণ কার্যকলাপকে—জীবনের অনিবার্য পরিণতি ব'লে তাঁদের সাহিত্যে প্রচার করছেন; অর্থাৎ তাঁরা প্রবৃত্তি-মার্গের দাবিকে একান্ত করে পাঠক-সাধারণের চোখের সামনে ধরছেন

এবং নিবৃত্তিযোগের কথাটাকে নানা ভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে উড়িয়ে দিয়ে ভাবছেন যে, খুব একটা নূতন তত্ত্বের সন্ধান দেওয়া গেল ! কিন্তু আসলে ওটা তত্ত্ব নয়, তথ্যও নয়। মূলতঃ ওটা একটি সাহিত্যিক ভঙ্গী, রুচিবিকার মাত্র।—escapasim বা পলায়নী বৃত্তিও হতে পারে।

যা হোক, অধ্যাপক হর্টনের উল্লিখিত মতবাদ সম্পর্কে আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ ও তড়িৎ-বিদ্যাবিশারদ এডিসন সাহেবকে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়। এডিসন সাহিত্যিক নন কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিদগ্ধ সমাজের অন্যতম মুখপাত্র। জাতির সাহিত্য জাতির সহিত সম্পর্ক-বিরহিত নয় এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তিনি সাহিত্যের উত্থান-পতন জাতির উত্থান-পতনের মতই দেখে থাকেন ; অতএব এডিসন সাহেবের মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে—এই বিশ্বাসেই বোধ হয় তাঁকে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন যে, "মিল্টন, বেকন, দান্তে, সেক্সপীয়রের সাহিত্য যা করবার তা করেছে। যে মানবতার উন্মেষ ঘটলে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্ভবপর হয়, তা মিল্টন-বেকন প্রমুখ প্রতিভাশালী কবিগণ করে গেছেন। এখন সে প্রয়োজন নেই, তাই তেমন কবি ও লেখক জন্মগ্রহণ করছে না। এটা ভাবের যুগ নয়, খেয়াল কল্পনার যুগ নয়, এটা কর্ম্মযুগ, আবিষ্কারের যুগ—প্রকৃতি দেবীর অবগুণ্ঠন মোচনের যুগ। এখনকার সাহিত্য পদার্থতত্ত্ব নিয়ে পূর্ণ থাকবে। এখনকার কবিতা কল্পনা নয় ; যা দেখছি, বুঝছি, শুনছি, তারই বর্ণনা। এখনকার সাহিত্য সৃষ্ট জগতের চাতুরী-বিকাশে প্রমত্ত থাকবে। মিল্টন, চসারের মাপকাঠিতে এখনকার সাহিত্য মাপলে চলবে না। সাহিত্য জাতির প্রকৃতির পরিচায়ক ; জাতির যেমন প্রকৃতি হবে, সাহিত্যও সেই প্রকৃতির আকার ধারণ করবে। সে জন্য চিন্তা করতে নেই, বিহ্বল হতে নেই। তবে জাতির উত্থান-পতন যে বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে বিধি মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। সুতরাং তার জন্য চিন্তিত হতে নেই। তবে আমি এটা স্বীকার করি যে, সাহিত্যে বিভীষিকা জাতির অধঃপতনের লক্ষণ বটে।"

এই প্রসঙ্গে এডিসন যে একটি বিশেষ আশার বাণী শুনিয়েছিলেন তা এই যে, খৃষ্টান ইউরোপ খৃষ্টানী সভ্যতা এশিয়া মহাদেশ থেকে পেয়েছিল ; মানব

জাতি সারাসেন ও আরব সভ্যতার কাছে সভ্যতার বর্ণপরিচয় করেছিল; অথচ ইউরোপ পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে একটা নিজস্ব সভ্যতার সৃষ্টি করেছে।" চীন ও জাপান যে সে পন্থা অবলম্বন করবে না, এমন কথা কেও বলতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা প্রাচ্য জাতি সকলের অধিকতর উপযোগিতাশক্তি (adaptability) আছে। সে জন্য এডিসনের মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সজ্ঘাতে একটা অভিনব সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে। সে পক্ষে যিনি অন্তরায় হবেন তিনি শুধু সাহিত্য ও ধর্ম্মের শত্রু নন, তিনি সমগ্র মানব জাতির শত্রুতা সাধন করবেন।

প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মসিঁয়ে ফাজি, অধ্যাপক হর্টন, এবং বৈজ্ঞানিক এডিসন প্রভৃতি সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি বিচার পূর্বক তার অভ্যুদয় ও অধঃপতনের যে সকল কারণ নির্দেশ করেছিলেন, আজিকার দিনেও শুধু পাশ্চাত্য সাহিত্যের নয়, আমাদের বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির বিচার করলে সেই কারণগুলিই আবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। সেজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতের উপর ভিত্তি ক'রে—এ আলোচনার অবতারণা করা হল।

সাহিত্যে স্বধর্মনিষ্ঠা

মানুষের ধর্মই সাহিত্যিকের ধর্ম—কি ব্যক্তিজীবনে কি সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রভাব না থেকেই পারে না—সেজন্য সাহিত্যিকের জীবনে ধর্ম তার রচনাকেও প্রভাবিত করে! সেজন্য স্বধর্মে দৃঢ় থাকার কথা পূর্বাচার্যগণ সাহিত্যিকদের শুনিয়ে এসেছেন। ধর্ম বলতে আমরা যপতপ মন্ত্র বা আনুষ্ঠানিক পূজা অর্চনার কথা বলছি না—আচার অনুষ্ঠান ধর্মের বহিরঙ্গ—আমরা বলছি সেই ধর্মের কথা যার মধ্যে আমাদের সত্তা বিধৃত এবং যা আমরাও ধারণ করে থাকি। তার স্বরূপ সম্পর্কে অর্থাৎ মানুষের ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়। কিন্তু মানুষের আর একটা দিকও আছে যা এই

ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে, সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্য বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।"

এই 'বড়ো' মানুষ হওয়ার কথা আমরা সাহিত্যে সদাচার ও মনুষ্যত্বের সাধনা সম্পর্কিত আলোচনায় বিশদভাবে বলেছি। এরই সঙ্গে স্বভাবতঃই আসে সাহিত্যে স্বধর্মনিষ্ঠার কথা। আজ একথা বিশেষ করে চিন্তা করে দেখলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লেখক স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাংলার অন্যতম চিন্তাশীল লেখক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—"বহু শত বৎসরের পরাধীনতার দণ্ড আজ আমরা ভোগ করিতেছি; তাই আমাদের চক্ষু আজ অন্যত্র নিবদ্ধ, বাহিরে নিবদ্ধ, বিদেশে নিবদ্ধ। * * * নিজের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন বলিয়াই পরের উঞ্ছ সংগ্রহ করিয়া আনন্দোৎসবের আয়োজন করিতেছি। কিন্তু এ ভিক্ষুকের ভোজে কে যোগদান করিবে? ভিক্ষুককে লোকে ভিক্ষা দেয়, আপন মনে করে না।" তিনি আরও বলেছেন—"স্বদেশাত্মার অবহেলায় চরিতার্থতা নাই", সেজন্য আজ আমাদের সম্মুখে "বিশ্বের পথ" উন্মুক্ত নয়, "আত্মচৈতন্যের অভাবে আজ আমরা মনুষ্যত্বের কাঙাল"—কল্যাণ-অকল্যাণের উপলব্ধি নেই বলে আজ স্বধর্মের প্রতিও আমরা নিষ্ঠা হারিয়ে বসে আছি।

কিন্তু আমাদের সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজের এই চিত্রই সম্পূর্ণ নয়—সামগ্রিকও নয়—কেন না সাধারণভাবে আমাদের অবস্থা অনুরূপ হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে বলেই আজও আমাদের সাহিত্য স্বধর্ম রক্ষা করে চলেছে—উৎকৃষ্ট উপন্যাস, রসোত্তীর্ণ কাব্য এবং বাণীবাহক শিল্পসুষমামণ্ডিত নাটকের দেখাও আমাদের ভাগ্যে ঘটছে। আমাদের জীবনের কোনও স্তরই যে আজ নবযুগের স্নিগ্ধ স্পর্শ পাইনি—নবচেতনার মধ্যে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং সমাজের প্রতি মমত্ববোধ যে অভিব্যক্ত

হয়নি একথা অবশ্য আংশিক ভাবে সত্য! তবে "বর্তমান মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যত নূতন পরীক্ষা, নূতন পথের সন্ধান চলছে, তত আর কোন পর্বে ঘটে নি।" তত্রাচ প্রবীণ নবীন এমন শক্তিমান একাধিক লেখকের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা স্বধর্মে বিশ্বাসী, সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং নিজের সৃষ্টির জোরে শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠিতই নন—খ্যাতি সম্মানের আসনেও সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে অন্তর্দৃষ্টির অভাবে আজ আমরা পরধর্ম ভয়াবহ জেনেও স্বধর্মের প্রতি বীতরাগ বা বৈরাগ্য পোষণ করে চলেছি—সাধনার দ্বারা সেই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হবে—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়, এছাড়া অভ্যুত্থানের অন্য পথ নেই। যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিশ্ববোধের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই এসত্য প্রচার করে গেছেন—তাঁরা আমাদের নবজাগরণের গুরু। ভারত-আত্মার অন্যতম আবিষ্কারক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম—তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে।"

অতএব সাহিত্যে ও সমাজে যদি আমরা ধর্মের প্রজ্ঞা-প্রজ্জ্বলিত দীপটিকে অনির্বান রাখতে পারি—তাহলে পরধর্মের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে স্বধর্মের উজ্জ্বল আলোকে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আলোকিত হয়ে উঠবে এবং বর্তমানকেও আমরা তার স্বরূপে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হব।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান

ব্যক্তিজীবন ও যুগজীবন

আনন্দের সন্ধানে সাধারণ মানুষকে অনেক দুর্গম পথে চলতে হয় কিন্তু সাহিত্যিকদের পক্ষে সে পথ দুর্গমতর। মানুষের মতো তাঁদের ক্ষমতা আছে অক্ষমতাও আছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, ব্যর্থতাও আছে এবং সাধারণ মানুষের মতো সাহিত্যিকদেরও সাংসারিক জীবনের প্রয়োজন ও দাবি একই রকমের। জীবনের নৈরাশ্য ও নিস্ফলতা, শারীরিক পীড়া ও মানসিক উদ্বেগ, ক্ষয়ক্ষতি এ সব স্বীকার করে নিয়েই তাঁদের নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য জীবিকা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হয়। তা' ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন ও সংরক্ষণ বিষয়ে সাহিত্যিকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধ করি সর্বাধিক। যে-কোনও মানুষের পক্ষে এ ভার যে দুর্বহ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সাহিত্যের সেবা ও সাধনা যাঁদের ধর্ম, সাধারণ মানুষের চাইতেও তাঁদের নানাপ্রকার অসুবিধা থাকে। মানুষের ভাগ্য নিয়ে তাঁদের দুশ্চিন্তার অবধি নেই—তার কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান; মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, সুবিচার ও নীতিজ্ঞান এবং তার জন্মগত অধিকার সম্পর্কে তাঁরা সর্বদা সচেতন; অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, এক কথায় জাতির সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা চিন্তিত; সাধারণ বা অসাধারণ মানুষের আচরণ, এমন কি তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠিগত চারিত্রিক উন্নতি অবনতি সম্পর্কেও তাঁদের চিন্তা ভাবনার বিরাম নেই। মানুষের ধর্ম, আদর্শ ও নৈতিক মানের উপর সাহিত্যিকদের বিশ্বাস থাকে এবং তাঁরা জানেন যে যা' উচিত তার পরিপ্রেক্ষিতে যা' ঘটছে তার প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব কম নয়। তবুও তাঁদের মনে হয়, এ জগৎ সংসার হয়ত অজ্ঞতা বশতঃই জীবনের চরম সত্য সম্পর্কে অন্ধ। হয়ত বা এ অন্ধতা তার ইচ্ছাকৃত।

সাহিত্যিকদের একটি পরিচয় এই যে নিজেদের রচনার মধ্যে তাঁরা বাঙ্ময়। তাঁরা সাধারণ্যে কেও-কেটা লোক নাও হতে পারেন কিন্তু সীমাবদ্ধ

সমাজের বাইরেও তাঁদের চিন্তাভাবনার পরিধি বিস্তৃত। তাঁদের দর্শন অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী; অন্তরঙ্গে তাঁরা যেমন নিবিষ্ট, বহিরঙ্গে তেমনি তাঁরা আবিষ্ট। মানুষের সুখ সমৃদ্ধি কল্যাণ ও আনন্দ সম্পর্কে সাধারণতঃ সকলের যা ধারণা এবং সে সকলের মধ্যে যে বহুবিধ কার্যকারণ আমরা লক্ষ্য করে থাকি—সে বিষয়ে সাহিত্যিকরা যে সচেতন—এ সত্য যে ভাবেই হোক তাঁদের রচনায় প্রকাশিত হয়। তাঁরা এটাও জানেন যে তাঁদের ব্যক্তিগত্ব কল্যাণ, অবশিষ্ট সকল মানুষের কল্যাণের অংশ মাত্র এবং তা' সেই সামগ্রিক কল্যাণের উপর নির্ভরশীল। সাহিত্যিকদের মধ্যে এখন অনেকে আছেন, বুদ্ধিজীবিদের মহলে যাঁদের স্থান সংকীর্ণ নয়। অবশ্য সত্যকে একমাত্র বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার যে একমুখী নিরীক্ষা তাঁরা তার পক্ষপাতী হতে চান না। যাই হোক, মানবজীবনের সমস্যা সমাধানের সেই চির পুরাতন ইচ্ছার দিক থেকে তাঁরা সকলেই এক সূত্রে বাঁধা।

কাজেই মানুষ শুধু ব্যক্তিরূপে জীবন যাপন করে না,—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সে যুগ-জীবনেই তার অস্তিত্ব বহন করে চলে। যাঁরা সাহিত্যিক তাঁরা সেই যুগ-জীবনের মূল্য ও উচ্চাশা বিচার করে দেখেন এবং ব্যক্তি-চরিত্রে ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় সেটা কতটা মূর্ত হয়ে উঠল তাও তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের যে বিচার বিবেচনা তার মধ্যে প্রতিফলিত হয় সমসাময়িক ব্যক্তি-মানসের রূপ। বর্তমানকালের মানুষ এবং তার জীবন সম্পর্কে যখন আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না, নানা ক্ষোভ ও অসম্পূর্ণতার জন্য হীনমন্যতা অনুভব করি, তখন বুঝতে হবে কোনও একটি আদর্শের মানে আমরা সেই জীবনের তুলনা করে দেখেছি। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে জীবনের উপাদান কি হওয়া উচিত এবং সে উপাদানের অধিকারী হওয়ার পক্ষে প্রকৃষ্ট পন্থাই বা কি হয়ত সাহিত্যিকরা সে বিষয়ে নিশ্চিত নন। উৎকৃষ্ট জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা এবং মানুষের সুখ শান্তি ও সর্বোত্তম কল্যাণ লাভের যে নির্দিষ্ট কার্যক্রম, যুগে যুগে সে সকলি বদলে যায়—যদিও তার মধ্যে কিছু কিছু শাশ্বত বস্তু অক্ষুণ্ণ ও অটুট থেকে যায়। যাঁরা বুদ্ধিজীবী সাবারণতঃ তাঁরা উচ্চ-শিক্ষিত—জাগতিক প্রশ্ন সমাধানের প্রয়োগ-রীতি তাঁদের অন্য রকমের—তাঁদের কাছে ব্যবহারিক সত্যের দাম বেশী কিন্তু যাঁরা সাহিত্যিক, বুদ্ধিবৃত্তি

সম্যক থাকলেও তাঁদের কাছে পারমার্থিক সত্যের মূল্য অনেক বেশি—কিন্তু প্রাতিভাসিক সত্যকেও (Phenomenal truth) তাঁরা উপেক্ষা করেন না। যাঁরা সাহিত্যিক তাঁরা অচলায়তন থেকে মুক্তি পাওয়ার সাধনা করেন; তাঁদের মননশীলতা, অনুভব ও কল্পনাশক্তি এবং অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ও জ্ঞানের উপর তাঁরা নির্ভর করতে পারেন বলে সমকালীন অবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মহৎ জীবনের সন্ধানে তাঁরা মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। তাতে করে মানুষ জীবনের মূল সমস্যার সমাধানকল্পে যে কার্যক্রম গ্রহণ করে, সমসাময়িক গন-মানসে তার তাৎপর্য তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেজন্য যদি সাহিত্যকে প্রচার-ধর্মী বলা হয়—তাহলে ভুল করা হবে; কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও নাটকের মধ্যে যদি কোনও Message বা বাণী থাকে—আর্টের দোহাই দিয়ে তাতে আপত্তি করা চলে না।

আদর্শগত বিরোধ

বর্তমান জগৎ বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার জটিল সংমিশ্রনের সম্মুখীন হয়েছে। সে বিষয়ের আলোচনার মধ্যে এমন একটি মনোভাব দেখা যায় যার অর্থ হচ্ছে এই যে, অবিলম্বে সকল সমস্যার সমাধান না হলে খুব সম্ভবতঃ সভ্যতার অধিকাংশ বা সর্বাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। সাহিত্যিকরা এ মনোভাব সমর্থন করেন না কারণ তাঁরা 'বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালে'র উপর বিশ্বাস রাখেন।

এই শিল্প বিজ্ঞানের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতির আসল প্রশ্নগুলি খুবই জটিল এবং সেগুলি আদর্শগত বিরোধের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত,—এই আদর্শগত বিরোধ আজ পৃথিবীকে দ্বিধাবিভক্ত করে ভয় দেখাচ্ছে যে তা এমন প্রচণ্ড জবরদস্তি ও জোরজুলুমে আত্মপ্রকাশ করবে যার অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট আমাদের কল্পনারও অতীত। মানবজাতির সম্মুখে কি বিরাট সভ্যতা-সঙ্কট যে আজ তার প্রগতির পথে ভয়াবহ বিঘ্ন উপস্থিত করেছে সেটা উপলব্ধি করার বিশেষ শক্তি আছে সাহিত্যিকদের। কি উপায়ে ন্যায়োপেত ও শান্তিপূর্ণ পথে সকল মানুষের, শুধু সঙ্গত দাবি ও আকাঙ্খা নয়, চিত্তের স্বারাজ্য লাভ সম্ভব হতে পারে সেকথা নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন আজকার

সাহিত্যিকরা—তাঁরা দ্রষ্টা ও স্রষ্টা দুইই। বৈজ্ঞানিকরা সে চিন্তা করছেন অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে।

সাহিত্যিক সামগ্রিক ছবির উপর আলোক সম্পাত করেন। তাঁর কলা-কৌশলে, কি কাব্যে, কি কথা সাহিত্যে, কি নাটকে এক একটি ছবি ফুটে ওঠে তা'র সামগ্রিক রূপ নিয়ে;—যেখানে তা' অসম্পূর্ণ, যেখানে তার অকথিত বাণী ব্যঞ্জনার মধ্যে মুখর, সেখানে পাঠক মনের কাছে তার অর্থ সমাধানের দায়িত্ব অনুচ্চারিত, খণ্ড খণ্ডের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সেখানে অসীমের দিকে সম্প্রসারিত। কাজেই তাঁর সাহিত্যকর্ম ধীর গতিতে চলে, সদ্য ফল প্রাপ্তির আশায় তখনই তিনি হাত বাড়ান না। তবে মানুষের সুখসমৃদ্ধি শান্তি ও আনন্দ বিধানের ব্রতকে সফল করাই হচ্ছে সাহিত্যকর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই জানি যে, যুগের আশা আকাঙ্ক্ষা, তার প্রত্যয় ও সংশয়, তার সন্তোষ অসন্তোষ এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের উপায়ের ইঙ্গিতও প্রতিফলিত হয় স্বধর্মনিষ্ঠ সাহিত্য চর্চায়। কিন্তু বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অবিলম্ব ফল লাভের জন্য শক্তির অপপ্রয়োগে দ্বিধা বোধ করে না।

সভ্যজগতের সর্বত্র অনেকে আজ 'আশুফলপ্রদ স্বপ্নাদ্য মাদুলির' মত বিজ্ঞানকেই সঙ্কট মোচনের একমাত্র এবং শেষ আশ্রয় বলে মনে করতে সুরু করেছেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি আলোচনায় যা বলেছেন তার মর্মার্থ এই যে শুধু আমাদের দেশে নয় সমগ্র পৃথিবীতেই বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়েছে। কারণ সাহিত্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যেভাবে আগিয়ে চলেছে এবং বিজ্ঞানে যে পর্য্যাপ্ত সম্পদ দেখা দিয়েছে তাতে সাধারণ মানুষও ভাব অপেক্ষা বস্তুর দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছে। এজন্য সাহিত্য দর্শন শিল্প প্রভৃতি পিছিয়ে পড়ছে। সমাজ-জীবনের উপরই সাহিতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখন সমাজ-জীবনের যে গতি দেখা যাচ্ছে তাতে ভাবের স্থান সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। সমগ্র মানব জাতি আজ ভাবের ক্ষেত্র থেকে ঐশ্বর্য সৃষ্টির দিকে মন দিয়েছে। বিজ্ঞানের কাছে তাই সাহিত্য ক্রমশঃ উৎসাদিত হতে চলেছে। সাহিত্য এখন প্রয়োজনের বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের সম্পদের

জৌলসের মধ্যে মানুষ আজ দিশেহারা হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানের চাপে সাহিত্যও আজ কোনঠাসা—মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

বিজ্ঞানের প্রভাব

একথা ঠিক যে সভ্যজগতের সর্বত্র অনেকে আজ বিজ্ঞানের উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাসপরায়ণ। তথ্যগত জ্ঞান বিতরণ এবং বহু সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানের শক্তি আছে, এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে সাফল্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের নিশ্চিত আশা। আরও সূক্ষ্মভাবে বলা যায় যে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান অবশেষে যে বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব এই স্থির বিশ্বাসের উপরই চলছে বিজ্ঞানীদের গবেষণা। বর্তমান যুগ তথ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং এ যুগের মানুষের বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে একদিন আমাদের আকাঙ্খিত সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। কাজেই সাধারণের সহজেই এই ধারণা জন্মেছে যে বস্তু জগতের তথ্য যেমন আমাদের অনধিগম্য নয় তেমনি জীবনের মূল্য বোধের যে সত্য আজ রহস্যাবৃত তা' কেনই বা আমাদের কাছে অপ্রকাশিত থাকবে। অনেকে আবার এমনও মনে করেন যে সেই সত্য জানবার জন্য মানুষের যে প্রবল আগ্রহ তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিপুল সাফল্য মিটিয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও অধিক জানবার কৌতূহল ও আকুলতাকেও বিজ্ঞান বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত করেছে।

কিন্তু মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রবলতম আগ্রহ হচ্ছে আপনাকে জানার। শাস্ত্র যেমন বলেছেন "আত্মানং বিদ্ধি"—নিজেকে জান। সে জানা স্থূলকে জানা নয়, সূক্ষ্মকে জানা—সেই সূক্ষ্মকে জানিয়ে দিতে পারেন কবি, সাহিত্যিক। যুগ যুগ ধরে মানুষ নিজেকে জানার চেষ্টা করে আসছে, এখনও সে জানার শেষ হয়নি—শেষ হবে কিনা তাও কেও বলতে পারে না। জানার শেষ হয়ে গেলে তো সৃষ্টির শেষ হয়ে যাবে—'কোনও দিন আর গোপন খবর নূতন' ক'রে মিলবে না। আসল কথা, যতদিন এই জানার সাধনা চলবে ততদিন মানুষ প্রতিদিন আত্মজ্ঞানের মধ্যে নবজন্মলাভ করবে—জীবনের এই তো গভীরতম রহস্য, সে রহস্যের সন্ধান দিতে পারেন, সাহিত্যিক,—বৈজ্ঞানিক নয়।

যা'হোক বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা আর একদিকে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মানুষ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানে ব্যবহার-বিজ্ঞান (Behaviour Science) সংযোজিত হয়েছে—তার মধ্যে আছে--মনস্তত্ত্ব, সমাজ বিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ও অর্থনীতি। বিজ্ঞানের কর্মপ্রণালী কি, তার লক্ষ্যই বা কি, এতে ক'রে তা জানতে পারা যায় অর্থাৎ তা' দ্বারা লব্ধজ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে এবং সে সকল ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি—বিজ্ঞানের এ অহঙ্কারের কথাও আজ শোনা যাচ্ছে।

এই বিজ্ঞানের প্রবর্তকেরা বলেন যে মানসিক রোগতত্ত্বের আলোচনা থেকে আমরা মানুষের প্রকৃতি এবং তার অতি তুচ্ছ থেকে অতি মারাত্মক রকমের মানসিক অসুস্থতার কারণ কি এবং তার প্রতিকারই বা কি, তার স্বরূপ উপলব্ধি করার আশা করতে পারি। সে রোগ-বিজ্ঞান অবশ্য কি তত্ত্বের দিক, কি ব্যবহারের দিক কোনও দিক থেকেই সাধারণের কাছে স্পষ্ট নয়—সে সকল বোধগম্য হওয়াও সহজ নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত মানসিক রোগনির্ণয়ের চেষ্টাই ছিল এর প্রধান কাজ, এখন মানুষের আচরণ এবং সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ বিজ্ঞানকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। হোক, তাতে ক্ষতি নেই। সমাজের গতি প্রকৃতির উপর যখন সাহিত্যকর্মের আদর্শ ও রীতিপদ্ধতির নির্ভরতা অস্বীকৃত নয় তখন যদি ব্যবহার-বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে ব্যক্তি চরিত্রের হৈদিশ পাওয়া যায় এবং সে চরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি প্রতিকারের উপায়ও উদ্ভাবিত হয়, তা'হলে সাহিত্য ক্ষেত্রের সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথও খুঁজে পাওয়া যাবে। সেখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের আপাত বিরোধেরও অনেকটা অবসান ঘটবে। কিন্তু "এহ বাহ্য— এর পরের কথা বলবার একমাত্র অধিকার আছে সাহিত্যের—যে সাহিত্য সত্যকার জীবন-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজকেও তার উত্তম অধমের তারতম্য সম্পর্কে সচেতন করে রাখে।

ফ্রয়েড্ (Sigmund Freud) বহুকাল আগে এবিষয়ে তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন। মনের গতি প্রকৃতি কি, কি প্রকারেই বা ভাবাবেগে চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়—সে সম্পর্কে তিনি যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মানুষের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য কিভাবে ক্রমশঃ গড়ে ওঠে, তারও বিশদ আলোচনা

আছে। তিনি প্রজ্ঞাত চেতনার উপর অবচেতনার অদম্য প্রভাবের (বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় সম্ভোগের অভীপ্সা) কথা উল্লেখ করে বলেছেন কি ভাবে অবদমন (Repression) অপ্রজ্ঞাত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে। ফ্রয়েড্ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে এবং তাঁর মতবাদও অধিকাংশ স্থলে বৈজ্ঞানিক সত্য ব'লে পরিগৃহীত হয়েছে—তা'তে করে তিনি চিন্তা-জগতে তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন ব'লে প্রসিদ্ধি লাভও করেছেন এবং মানবমনের নিভৃততম প্রদেশে বাসনার যে ক্রিয়া কাণ্ড চলে সে সম্বন্ধে গভীর অনুশীলনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। তাই আজ মানসিক রোগতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্গীভূত হওয়ায় ব্যবহার-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির চেষ্টার মধ্যে নব উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। ফ্রয়েডের চিৎশক্তিতত্ত্বের (Psychodynamic) বিশ্লেষণের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটেছে বুদ্ধিজীবীদের আলোচনার মধ্য দিয়ে। পরে ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে, কবির কাব্যে, নাট্যকারের নাটকে অর্ধ শতাব্দীব্যাপী তার প্রভাব আমরা দেখতে পেয়েছি—ঘটনা সংস্থান, ভাববিন্যাস ও চরিত্র চিত্রনের মধ্যে।

সন্নিবেশ সাধন

কেও কেও মনে করেন—ব্যক্তির ঋদ্ধিলাভ নির্ভর করে নিজেকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা এবং সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে তার অনুবর্তী হওয়ার উপর ; আবার কেও কেও মনে করেন, সেটা নির্ভর করবে দৃঢ় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বোধ এবং আপন আপন বিশিষ্ট সম্ভাব্যতা বা অব্যক্ত শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার উপর। এই মতানৈক্যের সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব নয়—তাই এই উভয়মুখী চিন্তাধারা আজ ব্যক্তিকে ও সমাজকে উপলক্ষ্য করে সিদ্ধান্তের পথ খুঁজছে। কাজেই ফ্রয়েডের মতবাদ যতই যুক্তিপূর্ণ, যতই বিজ্ঞানসিদ্ধ হোক, মানুষের দিক থেকে সুখ শান্তি ও আনন্দ লাভের প্রবল আগ্রহকে শুধু তথ্য-সংগ্রহের উপর নয়, মূল্য বোধের অনিবার্য প্রয়োজনের মধ্যেই জাগিয়ে রাখতে হবে। অতীতের জ্ঞানবিজ্ঞানের মৌল কার্যকারিতা উপেক্ষণীয় নয়, প্রয়োজন শুধু বর্তমানের পরিবেশে তার যথার্থ মূল্যাবধারণ। আজ সাহিত্যিকদের বলবার কথাও তাই।

সোজা কথা এই যে, যাঁরা ব্যক্তি তথা সমাজ ও রাষ্ট্রের শুভাকাঙ্ক্ষী, কি সাহিতিক, কি রাজনীতিক, কি বুদ্ধিজীবী, কি বৈজ্ঞানিক কারো দুশ্চিন্তার অবসান ঘটার আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে তাঁদের যেমন আশাবাদী হতে হবে, তেমনি জাগতিক ব্যাপারকে কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। যুগের দাবি কি?—প্রয়োজন কি?—জটিল প্রশ্নগুলি কি?—তার নৈরাশ্য তার ব্যর্থতা ও সংশয়, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাই বা কি?—এ সকল বিষয়ে চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ আছে। যুগের অশ্রুকাতর মর্মবেদনা যেমন আছে, তেমনি আছে তার বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তের অব্যক্ত বাসনা কিন্তু আনন্দ যে নেই, সান্ত্বনা যে নেই, ভবিষ্যতের আশাভরসা যে নেই এমন কথা ঘোর দুঃখবাদীও আজ বলবে না—। কালের দ্রুত আবর্তন বিবর্তনে সমাজের পরিবর্তন ও ব্যক্তিমানসের অস্বস্তি একেবারেই আকস্মিক নয়—। এই পটপরিবর্তনের মঞ্চসজ্জাকর যিনি বা যাঁরাই হোন, জীবন-নাটকের অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে যত বড় কুশলী নটের অভিনয়ই চলুকনা কেন, তার অনতিক্রম্য প্রভাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়—সাহিত্যিকদের তো নয়ই। "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা", অগনিত যুগযাত্রী চলেছে সে পথ অতিবাহন করে, সেখানে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের পাথেয় কোনটাই উপেক্ষণীয় নয় বরং উভয়ই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্বল। তাদের প্রাণে শক্তিসঞ্চার করবে আমাদের কাব্য ও সাহিত্য, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি। দৃষ্টি যাঁদের সংকীর্ণতার সীমারেখায় আবদ্ধ নয়, মন যাঁদের প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন নয়, বুদ্ধির দীপ্তিতে, উপলব্ধির স্বচ্ছতায়, আত্মার নির্মল জ্যোতিতে যাঁদের আত্মপরিচয়—এমন সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যেই সেই সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি নানাভাবে অভিব্যক্ত হতে দেখা যায়।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজ

সাংস্কৃতিক পরিচয়

একটি যুগকে অথবা একাধিক যুগকে আশ্রয় করে কোন জাতি গড়ে ওঠে না—অথবা সেই যুগের স্থচনা ও সমাপ্তিতেও কোনও জাতির জীবন সীমাবদ্ধ নয়। "অখণ্ড মহাকালকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহারই এক অংশকে অতীত বলি, এক অংশকে বর্ত্তমান বলি, আর এক অংশকে ভবিষ্যৎ বলি। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মধ্যে এক অখণ্ড যোগস্থত্র বর্ত্তমান আছে। ইতিহাস সেই যোগস্থত্রের সন্ধান প্রদান করে।"—বলেছিলেন, স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইতিহাস সম্পর্কে,—সাহিত্য সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা বলা চলে। জাতির ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পকলার আদর্শ-অনুশীলনে যেমন তার ঐতিহ্য গড়ে ওঠে—তেমনি এগুলির সমন্বয়ে ও সামঞ্জস্যে গড়ে ওঠে জাতির সংস্কৃতি। ইংরাজের culture বা জার্ম্মাণের kultur বলতে আমরা যা' বুঝি—বাঙালীর সংস্কৃতি বলতে তদপেক্ষা আমরা অনেকখানি বেশী বুঝি এবং কেমন করে বুঝি, জিজ্ঞাসা করলে আমরা বলব, একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি—সে সাহিত্য শুধু গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক বা প্রবন্ধই নয়, বাংলা ভাষায় লিখিত অতীত ও বর্তমানের সমস্ত গ্রন্থই আমাদের সংস্কৃতির আবর্তন-বিবর্তনের পরিচয় বহন করে। গত যুগ থেকে বর্তমান যুগে এবং বর্তমান যুগ থেকে ভবিষ্যৎ যুগে সে সংস্কৃতির যোগস্থত্র অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

সাহিত্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং সাহিত্যিকগণ সেই সংস্কৃতির আসল প্রচারক। কাজেই সংস্কৃতির পরিচয় দেবার পূর্বে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিচয় দেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। সমাজ-স্থিতির জন্য, অভ্যুদয়ের জন্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের সঙ্গে সংস্কৃতির প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। উচ্চ আদর্শ—উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা অপেক্ষা দৃষ্টান্তের দ্বারা অধিক দ্রুতবেগে জনসমাজের অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট করাতে

পারা যায়। সাহিত্য সে পক্ষে সর্বপ্রধান অবলম্বন এবং সেই সাহিত্যকে যাঁরা ধর্মানুষ্ঠানের আন্তরিকতায়, মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর নিষ্ঠায় ধারণ করেন, যুগে যুগে লোকে লোকে বহন করে নিয়ে চলেন, সেই সাহিত্যিকগণের মতি-গতি ও স্বভাব-ধর্মের আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর নয়।

সাহিত্য সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং গ্রন্থাকারে জনসমাজে প্রচারিত হয়ে থাকে। সাময়িক পত্রিকার স্বল্প আয়তনে আমরা কবিতা, গল্প, ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রভৃতি পাঠ করবার সুযোগ পাই—পাঠক-মনে তার প্রভাবও সেই জন্য স্বল্পকালস্থায়ী। গ্রন্থাকারে পাই সাহিত্যিকদের মননশীলতা, আদর্শবাদ ও আঙ্গিকের একটি পরিপূর্ণ পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের একটা স্থায়ী প্রভাবও উপলব্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত ভাবে সাহিত্যিক বিশেষের পরিচয় পাওয়া গেলেও সমষ্টিগত ভাবে আমাদের সাহিত্যিক সমাজের পরিচয় তাতে নেই কিন্তু সেই পরিচয়েই আমাদের জাতির পরিচয়। নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে যে সাহিত্যিক সমাজ উদাসীন, জাতির জীবনে তার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ।

সাহিত্যিক সমাজ

আধুনিকতার দোহাই দিয়ে এযাবৎকাল যে সাহিত্যির সৃষ্টি হল তাতে তার গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেকে সংশয় প্রকাশ করলেন এবং কেও কেও শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে নূতনত্বের মোহে সুপরীক্ষিত ও বহু সাধনালব্ধ পথকে পরিহার করাতে সাহিত্যের সহজ বিকাশ শোচনীয় ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অপরপক্ষ জোর গলায় বল্লেন—পুরাতন নিয়ে আমরা অনেক দিন কাটিয়েছি—মাজা ঘষা হয়েছে অনেক রকমে—এখন থাক না ধামাচাপা কিছুদিনের জন্য ঐ পুরাতন ফসিল, বর্তমান আসুক তার তীব্র তীক্ষ্ণ তীর্যক অস্ত্র নিয়ে, আমরা বুক পেতে দেব ; সবাই দেখবে আমাদের "পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্র লেখা"—এরূপ সদম্ভ উক্তি একেবারে নাটকীয় এবং হাস্যরসের উদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর কথা বলেছেন এই নূতন পুরাতন প্রসঙ্গে :—

"যাঁহারা বলেন সকল কবিরা ঐ এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন, নূতন কি বলিতেছেন ? তাঁহাদের কথার আর উত্তর দিবার কি আবশ্যক আছে ?

এক কথায় তাঁহাদের উত্তর দেওয়া যায়। পুরাতন কথা বলেন বলিয়াই কবিরা কবি। তাঁহারা নূতন কথা বলেন না। নূতনকে বিশ্বাস করে কে? নূতনকে অসন্দিগ্ধচিত্তে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে কে ডাকিয়া লইতে পারে? তাহার বংশাবলীর খবর রাখে কে? কবিরা এমন পুরাতন কথা বলেন যাহা আমার পক্ষেও খাটে তোমার পক্ষেও খাটে। যাহা আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে। যাহা শুনিবা মাত্র সুদূর অতীত হইতে দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিতে পারে ঠিক কথা! যাহা শুনিয়া আমরা সকলেই আনন্দে বলিতে পারি—পরের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য যোগ, অতীত কালের হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান কালের হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য ঐক্য! হৃদয়ের ব্যাপ্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়িয়া যায়!"

এই নূতন পুরাতনের বাদানুবাদে সাহিত্যিক সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, এই শ্রেণীগত ঐক্যে বৃহত্তর সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে যে বৈষম্য উপস্থিত হল—তাতে সম্প্রীতি ও সমবেদনার স্থান অধিকার করে বসল বিরোধ ও বিদ্বেষ—তাতে সুস্থ মনোভাবের অভাব বশতঃ দুটি বিভিন্ন শিবিরের যুদ্ধে সৃষ্টিকালের আবির্ভাবকে আমরা দূরে ঠেলে রেখে দিলাম। তাই আজ সাহিত্যিক সমাজের সাবলীল গতি নেই, মোহমুক্ত স্থিতি নেই, একটি সর্বাঙ্গীন মঙ্গল স্পর্শে—আমাদের মহতী কামনাকে প্রশস্ত এবং উদার সম্ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করবার ক্ষমতাও নেই। তবে সাধারণতঃ আমরা যেমন আজ বহু প্রকার রিক্ততার মধ্যে জীবন যাপন করে চলেছি তেমনি আমাদের সাহিত্য আত্মরক্ষা করে চলেছে প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যিকগণের অনন্যসাধারণ সাহিত্য কর্মের মধ্যে। অতএব বৃহত্তর সাহিত্যিক সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি, সে সমাজের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব করবার অধিকার অবশ্যই কারো কারো আছে; তাঁরাও এড়িয়ে চল্‌ছেন—পুনর্গঠনের গুরু দায়িত্বকে।

আমাদের জীবনে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে সেদিনও সাহিত্যের মহা-মহোৎসবে মেতেছি; সেখানে আনন্দের ভোজসভায় পংক্তি-ভোজন করে আমরা পরিতৃপ্ত হয়েছি। সাহিত্য সমাজ ব'লে সেদিন যে বৃহত্তর সমাজটি গড়ে উঠেছিল, আজ তার ভিত্তিমূলে ফাটল ধরেছে—সে

সমাজের বর্ণাঢ্য রূপ ছিল—রস-পরিবেশন ও রস-গ্রহণের পারস্পরিক আগ্রহের অতিশয্য ছিল—প্রাণ ছিল, প্রেরণা ছিল, সাধনা ছিল ; ছিল বলেই আমরা সিদ্ধির পথে অনেক দূর অবধি অগ্রসর হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আজ সে সমাজের খণ্ড বিখণ্ড বিকৃত, অস্বাভাবিক রূপ দেখে নিজেদেরই লজ্জা হয়— নৈরাশ্য অনুভব করি। বাইরে তাই সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রতি মর্য্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন আজ অতি মাত্রায় পোষাকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক স্থলে সাহিত্যিক সাহিত্যিককে চান না, কবি কবিকে পরিহার করে চলেন, সাহিত্যের মজলিস বা আড্ডা বসে সাহিত্য আলোচনার জন্য নয়, আত্ম-লাঘবকারী জুগুপ্সার প্রশ্রয় দানের জন্য। আজ কোনও কোনও সঙ্গতিসম্পন্ন সাহিত্যিক দরিদ্র সাহিত্যিককে কৃপার চক্ষে দেখেন, পরস্পরের মধ্যে যে হৃদ্যতা ও সহৃদয়তা ছিল তা' আজ প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। এ ভাবে মানুষ বাঁচে না, সাহিত্যও বাঁচতে পারে না ; মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও অপমৃত্যু বা অকাল মৃত্যু ঘটলে দেশও বাঁচতে পারে না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়েই দেশ বেঁচে থাকে, অগ্রগতির পথে তাদের দান ইতিহাসের পাতায় পাতায় সাফল্যের চিহ্ন রেখে যায়। কিন্তু এখন কি দেখছি? আমাদের সাহিত্যিক-সুলভ মনোবৃত্তি আজ কোন পথে চলেছে? কোনও কবির রসোত্তীর্ণ কবিতা অপর কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি আনন্দে অপরকে পড়ে শুনান কি? ভাল গল্প, চিন্তাশীল প্রবন্ধ, যুক্তিসহ আলোচনা আমাদের মধ্যে ক'জন নিয়মিত ভাবে পাঠ করেন এবং পাঠ করে তার শ্রেষ্ঠত্বের সংবাদ ক'জন অপরের কাছে সপ্রশংস চিত্তে বহন করে নিয়ে যান? যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছা থেকে সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকলে ব্যক্তির উৎসাহে গোষ্ঠী উৎসাহিত হয়ে সে দিনের মত সাহিত্য কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তা আজ আমাদের মধ্যে ক'জনের আছে? আমাদের অবস্থা এই প্রকার শোচনীয় হয়েছে বলেই আমাদের অর্থাৎ সাহিত্যিকদের মধ্যে অবসর মত মেলা-মেশা ওঠা-বসা করা দরকার। সাহিত্যিকদের পক্ষে একান্তে বাইরের সর্বপ্রকার কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার প্রয়োজন হয় তখনই যখন তাঁরা চিন্তা করেন, অধ্যয়ন করেন অথবা গভীর মনোনিবেশ সহকারে সাহিত্য রচনা করেন। এটা যেমন

সাহিত্যিকদের জীবনের একটি দিক, অপর দিকটি হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা, নিজের নিজের রচনা পাঠ করে অপরকে শুনান এবং সে সম্বন্ধে তাঁদের মতামতের দ্বারা নিজের রচনার উৎকর্ষ সাধন করা অথবা তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। এ কাজ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভা ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবে হতে পারে, তেমনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে বিস্তৃত হতে পারে সাহিত্য সম্মেলনের দূর প্রসারী সার্থকতার দিকে। অবশ্য এর কিছু কিছু নিদর্শন সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে।

সাহিত্য ও সাহিত্য পরিষদ

আজ আমাদের দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও শ্রমিক আন্দোলনকে উপলক্ষ করে আপন আপন দল গঠনের উদ্যোগ দেখা যায়, কিন্তু সেরূপ কোনও উদ্যোগ আমাদের সাহিত্যিক সমাজে দেখা যায় না। সাহিত্যে বিভিন্ন দল আছে কিন্তু সাহিত্য-সমাজের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রতীক-স্বরূপ আমরা একটি সাহিত্য-শতদলের স্বষ্টি করতে পারি।

এই সাহিত্য-শতদলই হচ্ছে সাহিত্য পরিষদ। পূর্বে এই পরিষদের প্রতি বৎসর আনুষ্ঠানিক কর্ম ছিল—"বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন" আহ্বান করা। এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়েছিল "ভাষা-সংস্কার, ইতিহাস-সংকলন, ভৌগলিক তথ্য সংগ্রহ, দর্শন-বিজ্ঞানাদি বিষয়ে গ্রন্থ-সংকলন ও সারস্বত-ভবন প্রতিষ্ঠা।" নিয়মাবলীর মধ্যে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য অংশ ছিল—"উচ্চ-নীচ সকল সাহিত্য-সেবীর ইহাতে সমানাধিকার থাকিবে, বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় তৎস্থানীয় সমর্থ সাহিত্যানুরাগীর আনুকূল্যে ইহার অধিবেশন হইবে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে (কাশিম বাজার) ইতিহাস শাখার সভাপতি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেছিলেন ;—

"বঙ্গ-সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করা এবং স্বদেশের কল্যাণ সাধন করা এক কথা, বরং বলিতে পারি ইহাই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধন চেষ্টার প্রথম চেষ্টা—মূল চেষ্টা ; ইহার তুলনায় অন্যান্য চেষ্টা সাধুবাদ লাভ করিতে পারে না। ইহাকে কেবল কল্যাণ সাধন চেষ্টা বলিয়াই নিরস্ত হইতে পারি না। ইহা পুণ্য—ইহাই শ্রেষ্ঠ পুণ্য। "নোচ্চৈঃ স্বদেশহিতসাধনতোঽস্তি পুণ্যম্।"
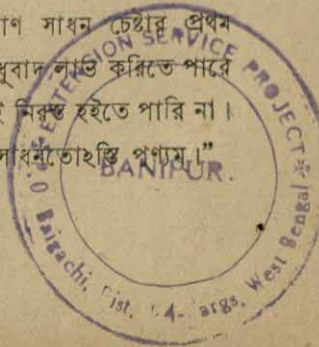
সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, প্রীতি ও বন্ধুত্বের পরিচয় এবং আলিঙ্গন ও রহস্যালাপের মধ্যে সে কালের বাংলা সাহিত্যিক সমাজের যে প্রীতিকর চিত্রটি দেখা যেত, বৃহদাকারে বা ক্ষুদ্রায়তনে তা'র বাস্তব রূপ একালেও যে কদাচ কখনও চোখে পড়ে না এমন কথা বলা যায় না, তবে আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সাহিত্য সম্মিলনের কল্পনা ও সম্ভাবনা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। কাশিমবাজার, কলিকাতা, চট্টগ্রাম বা বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনের তুল্য অথবা তাহার অক্ষম অনুকরণেও বাংলা দেশের কোথাও কোনও অধিবেশন হতে দেখলাম না। এপর্যন্ত কেও তার জন্য চেষ্টাও করলেন না।

সাম্প্রতিক সাহিত্যিক সমাজ

সাহিত্যের সেবা ও সাধনা আজকার দিনে আমাদের এই বর্তমান পরিবেশে, এই পরিবর্তিত সমাজ জীবনে অন্যান্য বিষয়ের মতই "পোষাকী" হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমরা বক্তৃতা-মঞ্চে আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব প্রচারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠি অথচ আমাদের সাধারণ আচার-ব্যবহার সৌজন্য ও ভব্যতা-বোধ যে আজ একান্তই"পোষাকী"হয়ে উঠেছে এটা আমরা ভেবে দেখি না। সাহিত্যের প্রতি মানুষের আন্তরিক আকর্ষণ ও অনুরাগ যে আজ মন্দীভূত হয়ে পড়েছে এর নানাবিধ সাম্প্রতিক কারণ দেখিয়ে অম্লান বদনে আমরা বলে থাকি যে "এতো হবেই" "এই তো স্বাভাবিক" "ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের অবস্থার এটা প্রতিক্রিয়া মাত্র কাজেই এতে দুঃখ পাবার কিছু নেই, বেদনা-বোধ করিবার হেতুও নেই।" ভাবটা এই রকম যে, এই নিস্পৃহতা বা নির্লিপ্ততা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের কোনও চেষ্টারও যেন প্রয়োজন নেই। এটা যে শুধু সাহিত্যক জীবনের দুর্গতি তাই নয়, এটা সমগ্র জাতিরই ক্লৈব্য। এ থেকে আমাদের রক্ষা পেতেই হবে। কি করে রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। অথচ কৈ তার কোনও চেষ্টাই তো দেখা যায় না। একদা বাঙালী তার সাহিত্য নিয়ে এমনই মেতে উঠেছিল যে সেটাকে আমরা বহু দিন পরে বাংলা সাহিত্যের এক নব অভ্যুদয়ের সূচনা ভেবে উল্লসিত ও উৎসাহিত হয়েছি, মনে মনে গর্বও অনুভব

করেছি। আজ দেখা যায় অসংখ্য সাহিত্যিকের সমাবেশ এবং অসংখ্য পুস্তক প্রকাশের সমারোহ কিন্তু সামাজিক ঐক্য সেখানে অনুপস্থিত।

সেকালের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী

যেদিন বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালগণ তাঁদের সমস্ত অন্তর দিয়ে সাহিত্যের সাধনা করেছেন, একাগ্র নিষ্ঠা ও অচলা শ্রদ্ধার দ্বারা, উদার মনোভাব ও প্রশস্ত শুভবুদ্ধির দ্বারা সমবেত ভাবে সাহিত্য-সাধনার পথ থেকে সমস্ত কণ্টক নির্মূল করবার কঠিন পণে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, জাতির জীবনে সাহিত্যের অপ্রমেয় ও অপরিহার্য প্রভাবের কথা, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের জন্য সাহিত্যসমাজের অনিবার্য প্রয়োজন ও সার্থকতার কথা। তাই সেদিন সাহিত্যিক সমাজকে তাঁরা শুধু সাহিত্য-জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার উপায়রূপে স্বীকার করেই ক্ষান্ত হন নি, পরন্তু প্রতি বৎসর সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন সম্পন্ন করে আমাদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ কালের জন্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

এই "সাহিত্য সম্মিলন"এর উদ্যোগ-পর্বে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। "সাহিত্য সম্মিলন" সম্বন্ধে তৎকালে তিনি যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ এই যে, যত দিন আমরা আমাদের নিজস্ব ভাব-রাজ্যের প্রজা ছিলাম তত দিন ঘরে বসে জাতিকুলমান বজায় রেখে বাইরের প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে বলা যেত যে "কাশীতীর্থে আমার কাজ কি—"শ্যামাপদ-কোকনদ"ই "আমার তীর্থ রাশি রাশি"। সেখানেই আমার অজস্র পুণ্য লাভ হবে। কিন্তু যখন বাইরের নানা ভাব ও মননশীলতা আদর্শ ও অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটতে আরম্ভ হল তখন তিনি বললেন, "ঘরের দিকে তাকাইয়া মনে হইল আত্মান্বেষণের প্রয়োজন আছে। নিজের সব থাকিলেও অনেক কিছু নাই, ইহা ভাবিয়া কাঁদিলাম—কাঁদিয়া আত্মদর্শন লাভ করিলাম। তাই আকাশগঙ্গা ভাবতরঙ্গিণী ভাষামন্দাকিনীর প্রবাহে অবগাহন স্নান করিবার সাধ হইল। যে ভাষার অন্তরে ভাবের ঠাকুর লুকান আছে, যে ভাষার কূলবিস্তারিণী বেলাভূমির স্তরে স্তরে যুগ-যুগান্তের ভাব ও গৌরব গাথা

লুকান আছে, যে ভাষার স্নেহশীকরসম্পৃক্ত শীতল চেলাঞ্চলের আবরণে বঙ্গীয় মানবতার নিদর্শন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে,যে ভাষা ও সাহিত্য ভাগীরথীর ন্যায় আমার সর্ব্বস্ব সর্ব্বাবলম্বন ইহ-পরকাল ; পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা, কোমলতা যাহাতে নিত্য বিদ্যমান, জনমে-মরণে জরায়-যৌবনে যাহার তীরে যাইয়া আমি শান্ত ও মুগ্ধ হই, আমার অনন্ত পিতৃগণের তর্পণ করিয়া আমি সুখী হই—বাঙ্গালীর সেই 'সাত রাজার ধন মাণিক' ভাষাতটিনীর তরলতরঙ্গে ডুব দিবার অর্দ্ধোদয়-যোগকাল উপস্থিত হইল। তখন হাসিয়া বলিলাম—

"ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।"

তখন "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন" প্রচেষ্টার মধ্যে খানিকটা ব্যক্তিগত দলাদলি ও রেষারেষির ভাব দেখা দিয়েছিল। তার ইঙ্গিত দিয়ে পাঁচকড়ি বাবু বললেন—"উহাকে এই ভাবে বুঝি বলিয়াই তোমাদের ব্যক্তিগত দলাদলি রেষারেষির দিকে দৃষ্টিপাত করি না ; তীর্থগুরুদের দ্বন্দ্বে দৃক্‌পাত করি না। নিজের ভাবে বিভোর হইয়া জাতি-প্রীতি-ত্রিবেণী-সঙ্গমে শুভক্ষণে যাইয়া ডুব দিই। একবার ডুব দাও—'শ্যামা জন্মদে' বলিয়া একবার ডুব দাও—সতী-অঙ্গ-লাঞ্ছিত বাহান্নপীঠে বিভূষিতা সুজলা, শ্যামলা, গিরিমেখলা জন্মভূমিকে স্মরণ করিয়া একবার ডুব দাও। দেখিবে, ফল ফলিবেই।"

এই ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই তিনি চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে গিয়েছিলেন ; সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি বুঝলেন, বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে গিয়েছে, সাহিত্যের সেই মহাতীর্থে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্নান করছে। "মায়ের ভাষায় দুই ছেলেই সমান ও সমভাবে অধিকারী।" তিনি বললেন, "আমরা দুই ভাই, আমাদের মাকে যে নয়নে, যে ভাবে দেখিব, সে নয়নে আর সেই ভাবে আর ত কেহ দেখিতে পারিবে না। এই দর্শন-সিদ্ধিই সাহিত্য সম্মিলন। ইহাই আমার স্মৃতি, আমার শ্রুতি, আমার ধর্ম্ম, আমার কর্ম্ম ;—আমার সমাজ ও সাহিত্য।"

সাহিত্য-সাধনার পথে

আজকার দিনে সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা ক'জন সাহিত্যের

সত্যকার মূল্য ও সার্থকতা এমন গভীর শ্রদ্ধায় উপলব্ধি করি; ক'জনই বা জাতির জীবনে সাহিত্যকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করি? সাহিত্য-সেবাকে স্বার্থ নিরপেক্ষ ভাবে ক'জন আমরা আমাদের অন্তরের একান্ত নিষ্ঠায় পবিত্র সাধনা বলে গ্রহণ করতে পেরেছি? আজ আমাদের আত্মচেষ্টায় অবিশ্বাস, আত্মসামর্থ্যে কুণ্ঠা, আত্মগৌরবে অনাসক্তি এসেছে—তাই আজ আমরা ভাঙ্গতে পারি, গড়তে পারি না, সমালোচনা করতে পারি কিন্তু সংস্কার করতে জানি না, প্রাচীনকে অকর্মণ্য ও নবীনকে অর্বাচীন ব'লে উড়িয়ে দিই। আমরা মুখে পরিবর্তন চাই কিন্তু উত্থান-পতনের আবর্ত্তন বা সঙ্কট থেকে অভ্যুদয়ের স্বাভাবিক বিবর্ত্তন দেখলে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের জাতির ইতিহাস তা'নয়, আমাদের আদর্শও প্রকৃতপক্ষে এর বিরোধী! তবে কি আমাদের কোন আশা নেই? আশা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, "সংসারে কেবল পরাজয় নাই—জয়-পরাজয়ও আছে; কেবল পতন নাই, উত্থান-পতন আছে; কেবল মন্দ নাই, ভাল-মন্দ আছে। আছে বলিয়াই আশা আছে, যে পরাজিত, তাহার আবার জয়লাভের আশা আছে; যে পতিত তাহার আবার উত্থিত হইবার আশা আছে—যে মন্দ তাহার আবার ভাল হইবার আশা আছে।"

আজ আমাদের সাহিত্যকে মহিমান্বিত করতে হলে, সাহিত্য-সমাজকে ভাবগঙ্গায় শুচিস্নাত ক'রে নূতন জীবন-বোধে উদ্বোধিত করতে হবে; তার পূর্বে সমগ্র বাঙ্গালী সাহিত্যিককে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। উদার দৃষ্টি ও সহৃদয় ব্যবহারের দ্বারা "সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে, সমস্ত ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের অপরিহার্য অসামঞ্জস্যের মধ্যে এক বিচিত্র সামঞ্জস্যের পরিচয় প্রদান" করতে হবে। সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপনের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে না পারলে এ কাজ কখনই সুসম্পন্ন হতে পারে না। এই কার্যসাধনের "মূলমন্ত্র একতা, তাহার মূলমন্ত্র স্বার্থত্যাগ—তাহার মূলমন্ত্র অকৃত্রিম অনাবিল স্বদেশপ্রীতি।" সাহিত্য সম্মিলনের বিরাট ক্ষেত্রে, বিপুল সম্ভাবনায় আস্থা রেখে আমরা কি আবার বাংলা দেশে একটি আদর্শ সাহিত্যিক সমাজ গড়ে তুলতে পারব না?

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু দুঃসাধ্য কাজের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—বিলুপ্ত সাহিত্যরত্নের উদ্ধার সাধনে তাঁদের প্রশংসনীয় চেষ্টার কথাও আমরা জানি কিন্তু এমনি একটি প্রতিষ্ঠানই তো সাহিত্য সমাজের পুনর্গঠনে সাহায্য করতে পারে ;—সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য সাধনের দ্বারা সাহিত্য সমাজকে রক্ষা করতে পারলে—সত্যকার সাহিত্য সাধনার পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হবে—এ আশা পোষণ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

সমাজ-সচেতন সাহিত্য

সাহিত্যে সমাজ-সচেতন কথাটি খুব আলগাভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—কেন না সাহিত্য মাত্রেই তো সমাজ-সচেতন, সমাজ সম্পর্কে চৈতন্য বিরহিত কোনও সাহিত্যের—তা' কাব্যই হোক আর যাই হোক—কল্পনা করা যায় না। স্বভাবতঃই সমাজের রূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় এবং তার আলোচনা—সাহিত্যিক মতিবুদ্ধির প্রণোদনার দিক থেকে চলতে পারে।

আমাদের জীবনে আজ যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে; সমাজ-সচেতন মানুষ হিসাবে সাহিত্যিকদের মনের উপর তার প্রভাব বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ মন থেকে সাহিত্যিক মনের পার্থক্য এই যে, সে মনটি অধিকতর সংবেদনশীল। এই কারণেই জাতির সাহিত্যে কালের ছাপ পড়ে—যুগকে অতিক্রম করে সাহিত্যিকের মননশীলতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পটভূমিতে একালীন সুখ দুঃখ, স্খলন পতন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে। অনুক্রমিক ঘটনা পরম্পরার সংকলনে ইতিহাস লিখিত হয়ে থাকে কিন্তু সাহিত্যে ঘটনা উপলক্ষ মাত্র। সাহিত্যিক দেখেন মানুষকে—যে মানুষ ঘটনার সৃষ্টি করে, আর যে মানুষ নিজেই সাহিত্যিকের সৃষ্টি।

যে সমস্যা আজ মানুষকে বিচলিত ও বিধ্বস্ত করছে—তার সমাধান কল্পে সে নির্বিচারে যে কোনও উপায় অবলম্বন করছে। মনুষ্যোচিত কর্মের প্রধানতম আশ্রয়ভূমি নৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ থেকে সেইজন্যই আজ মানুষ বার বার বিচ্যুত হয়ে পড়ছে—এ শোচনীয় ঘটনা সাহিত্যিক মনকে অবশ্যই প্রভাবিত করে থাকে।

কিছুকাল আগে এ্যালডুস্ হাক্স্লি "Ape and Essence" নামক যে গল্পের বই লিখেছেন তা নিছক গল্পের বই হয়ে ওঠেনি, কারণ আখ্যান বস্তু অপেক্ষা নৈতিক উদ্দেশ্যের দিকেই তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন বেশি ; তাকে সাময়িক পাপাচার বা গর্হিত কার্যের তীব্র প্রতিবাদ ও শ্লেষাত্মক রচনা বলা যেতে পারে। Point Counter Point—লেখার পর হাক্স্লি বহুদিন কোনও বই লেখেন

নি। তার পর তিনি লিখলেন—Brave New World, After Many a Summer, Time must Have a Stop ইত্যাদি। এই সবগুলি বইতেই আমরা গল্প ভাগ অপেক্ষা নৈতিক উদ্দেশ্যের অলোচনাই দেখতে পাই বেশি।

Ape and Essence এর গল্পটি নিম্নবর্ণিত ছায়াছবির জন্য সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপির (Film Script) আকারে লেখা। সেটা যেন ঘটনাক্রমে Dustbin বা ময়লার টিনের মধ্যে পাওয়া গেল। গ্রন্থকারবর্ণিত এই পাণ্ডুলিপির লেখক ট্যালিস্ ইচ্ছা করেছিলেন, এখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তিনি তাঁর পৌত্রীকে যুদ্ধোত্তর জার্মানির হাত থেকে বাঁচাবেন—জার্মানিতে তখন কয়েকটুকরো চকোলেটের বদলে যুবতী মেয়েরা আত্মবিক্রয় করতে সুরু করেছে। হলিউডে সেই ছায়াচিত্রের পাণ্ডুলিপিখানি বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা করবার আগেই ট্যালিসের মৃত্যু হল। গল্পটির আখ্যান ভাগটি সংক্ষেপে এই ভাবে চলেছে। লেখক কথিত তৃতীয় মহাযুদ্ধের পর বর্ত্তমান সভ্যতার উদ্ভব হল শুধু নিউজিল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে একটি স্থানে। এটমবোম্ ও জীবাণু সংশ্লিষ্ট যুদ্ধের ফলে আমেরিকায় এক মনুষ্য জাতি জন্মাতে লাগল, রক্তে তাদের মানসিক পঙ্গুতার বিষ সংক্রামিত। তারা "রেলিয়াল" অর্থাৎ অন্যায় ও অশুভের দেবতা শয়তানকে পূজা করে। এর পর দেখা যায় বাইবেল ও নৃতত্ত্ব থেকে উপাদান সংগ্রহ করে হাক্সলি আর এক নূতন পরাধর্ম্মের যে রূপকটি খাড়া করলেন, তা এই ঃ—নিউজিল্যাণ্ড থেকে একদল বৈজ্ঞানিক কালিফোর্ণিয়ার উপকূলে উপস্থিত হলেন প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাংশ অনুসন্ধান করতে। এই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন উদ্‌ভিদ্ তত্ত্ববিদ ছিলেন, তাঁর নাম ডাঃ পুল—আজীবন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ডাঃ পুলকে কে বা কারা যেন হরণ করে নিয়ে গেল। এই গল্পে বর্ণিত প্রাক এটম যুগের প্রাচীন রীতি অনুসারে—নরনারী সাত বৎসরে পাঁচ সপ্তাহ ছাড়া ইন্দ্রিয়সম্ভোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবার কথা। এই পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তারা দুই সপ্তাহ, অবাধ ও অসংযত যৌন-সম্ভোগে রত থাকবে এমন রীতিরও প্রবর্তন তাতে দেখা যায়। তারা সকলে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হবে। পুরুষ—"না" এই কথাটি লিখিত নারীর গাত্রাবাস ছিঁড়ে ফেলবে এবং অকথ্য ও অদম্য যৌন-সম্ভোগে

সকলে উন্মত্ত হয়ে পড়বে। এই নির্দিষ্ট সময় ছাড়া শতকরা ১০ থেকে ১৫ জন যারা যৌন-লালসা চরিতার্থ করতে যেয়ে ধরা পড়ে যাবে, এই গল্পে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে "Hots" অর্থাৎ যৌন-লালসা-দৃপ্ত। তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ইচ্ছা করলে তারা খোজা পুরোহিতের দলে ভিড়ে যেতে পারে। কখনও কখনও তারা এই বিধি-নিষেধ-বর্জিত সুদূর উত্তরে অবস্থিত একটি ছোট উপনিবেশে পালিয়ে যেতেও পারে। গল্পে বর্ণিত ক্যালিফর্ণিয়ায় ধ্বংস-প্রাপ্ত স্থানের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করবার ভার থাকে ডাঃ পুলের উপর। তিনি একদিন জনৈক যৌন-লালসা-দৃপ্তের অসৎ সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে—উত্তরে অবস্থিত উপনিবেশে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছায়াচিত্রের এই পাণ্ডুলিপিখানির হাস্যকর গল্পভাগের জন্য হলিউডের পক্ষে মনোনীত করা সম্ভব হোক আর নাই হোক এটা যে এটম্-উত্তর যুগের প্রতিক্রিয়ায় বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্ম ও নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ হননের একখানি সম্ভাব্য চিত্র এবং সে যুগে সকল মানুষই যে বর্বর হয়ে শুধু শয়তানের পূজা করবে—এটা তারই বিকারগ্রস্ত উদ্ভট কল্পনামাত্র—এ তর্ক অবশ্য এখানে অবান্তর। কারণ সমাজের বিকৃত রূপই লেখকের সমাজ-সচেতন ও সংবেদনশীল মনকে চঞ্চল করে তুলেছে, এ বর্ণনা তারই প্রতিক্রিয়া। প্রকৃতির অফুরন্ত দানের অপব্যবহার করে মানুষ যে বর্তমান সভ্যতার ধ্বংসসাধনে সচেষ্ট হয়েছে— এলডুস্ হাক্সলি সে সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ইঙ্গিত করেছেন।

আধুনিক যুগের মানুষ মনে করে প্রকৃতিকে সে জয় করেছে কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সে তা পারেনি—"He has merely upset the equilibrium of nature by fouling the rivers, killing off the wild animals, washing the top soil into the sea, burning upon ocean of petroleum, squandering the minerals it has taken the whole of geographical tone to deposit."

অর্থাৎ নদ নদী কলুষিত ক'রে, বন্য পশুদিগকে হত্যা ক'রে, অরণ্যের ধ্বংস সাধন ক'রে, বিধৌত মৃত্তিকার অগ্রভাগ সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রে, সাগর প্রমাণ

খনিজ তৈল দগ্ধ ক'রে, বহু যুগব্যাপী যে সকল খনিজ সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে দুই হাতে তার অপব্যয় ক'রে, মানুষ কেবল প্রকৃতির ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করেছে।

এরই নাম কি সভ্যতা? এরই নাম কি অগ্রগতি? পৃথিবীর জন-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ—নিকৃষ্ট কৃষিকার্যের জন্য, মৃত্তিকায় অবিরাম ফসল ফলানর জন্য ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। একদিকে শিল্পোন্নতির অবিরাম ঊর্ধ্বগতি, অপর দিকে ভূমির উৎপাদন শক্তির শোচনীয় অধোগতি, —সবই তো মানুষকে নরাধমের স্তরে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং পাপাসক্ত জড়বুদ্ধির ভৈরবীচক্রে তার আত্মসমর্থনের যুক্তিও তো তাই। এ যুগের মানুষের অধঃপতনের মুল কারণ হল এই যে তার স্কন্ধে—অগ্রগতি ও জাতীয়তা নামক ভাবের ভূত চেপে আছে—লেখকের অভিমত হ'ল এই এবং এ অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর গল্পে বর্ণিত পল্লী-যাজকের মুখ দিয়ে।

যাঁরা হাক্সলির বই পড়েছেন তাঁরাই তাঁর বহু বিষয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ ইঙ্গিতের সহিত পরিচিত আছেন—এখানেও তিনি প্রত্যেক বিষয়েই তাঁর দার্শনিক মত ব্যক্ত করেছেন এবং এক একটি অপরিচিত ব্যাখ্যা দ্বারা নিজের বক্তব্যকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। আমরা এই গল্পের মধ্যে সর্ব প্রথম ধাক্কা খাই—প্রথম পৃষ্ঠাখানি উন্মোচন করে। প্রথমেই তিনি লিখেছেন "It was the day of Gandhi's assassination" অর্থাৎ সেদিনটি ছিল গান্ধীহত্যার দিন। কিন্তু দেখা যায় বিশ্ববিখ্যাত এই শোচনীয় ঘটনাটির উপর কোনও ছায়াপাত না করে গল্পে-বর্ণিত হলিউডের মানুষটি শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছে। হ্যাক্সলি কোনও কাজের ফলাফল অপেক্ষা তার পন্থা সম্বন্ধেই অধিকতর সচেতন সুতরাং তাঁর শান্তিবাদী মন যে মহাত্মাজীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে গান্ধীজীর পঞ্চায়েৎ শাসন পরিকল্পনাকে তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। গান্ধীজী সম্বন্ধে তাঁর সে ব্যাখ্যা এ দেশের পাঠক সমাজকে ব্যথিত করবে। তিনি বলেছেন—Against the evil doctrine of progress Gandhi was re-actionary who believed only in people. Squalid little individuals governing

themselves, village by village and worshipping the Bramhan who is also Atman. But the whole story of Gandhi included an inconsistency, almost a betrayal, for he got himself involved in the subhuman mass-madness of nationalism. He imagined that he could mitigate the madness and convert what was satanic in the state to something like humanity. But the saint can cure our regimented schizophrenia, not at the centre but at the periphery."

অর্থাৎ অগ্রগতি সম্বন্ধে এই যে ক্ষতিকর মতবাদ তৎসম্পর্কে গান্ধীর মন ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর বিশ্বাস ছিল একমাত্র জনগণের উপর। সেই কদর্য ক্ষুদ্রকায় লোকগুলি পল্লীতে পল্লীতে নিজের নিজের গোষ্ঠীকে পরিচালনা করে—পূজা করে ব্রহ্মের এবং সেই ব্রহ্মও হচ্ছে "আত্মা"। কিন্তু গান্ধীর কার্যকলাপের ইতিহাসে যে অসামঞ্জস্য আছে তা প্রায় বিশ্বাস-ঘাতকতার সামিল। কারণ তিনি নিজে নিম্নস্তরের জনসাধারণের যে উন্মত্ত জাতীয়তা তারই মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন—। তিনি ভেবেছিলেন, সে উন্মত্ততা প্রশমিত করবার এবং শয়তানকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করবার শক্তি তাঁর আছে। কিন্তু যিনি মহাত্মা, তাঁর পক্ষে সুসংবদ্ধ এই ধর্ম-উন্মত্ততার আরোগ্য সাধন করা কেন্দ্রদেশে সম্ভব নয়, সম্ভব পরিধিতে অর্থাৎ ভিতরে নয় বাইরে সে উন্মত্ততা প্রশমিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

কাজেই হাক্সলি মনে করেন যে যারা বুদ্ধিমান, ভবিষ্যৎদর্শী, যারা শৃঙ্খলা ও পূর্ণ সাফল্যের প্রতি আস্থাবান, তাদের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধীর পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু ঠিক তা নয়। বস্তুতঃ যারা অসম্ভব রকমের প্রতিক্রিয়াশীল, যাদের কার্যকলাপ দুর্বোধ্য ও প্রচ্ছন্ন, এবং যারা কোনও একটি বিশেষ ধর্মের নবজাগরণের জন্য সচেষ্ট, তাদের হাতে গান্ধীজীর এই আপাত পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু তাঁর শাশ্বত শান্তির বাণী বিশ্বজগৎ ক্রমশঃ সর্বান্তকরণে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে।

তথাকথিত অগ্রগতি ও জাতীয়তার উপর হাক্সলি যে দোষারোপ

করেছেন তা কিছুটা মেনে নিলেও আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সজ্ঞানে শয়তানের পূজা ক'রে আজ মানুষের যে অধোগতি হয়েছে এটাই কি তার একমাত্র কারণ? আমরা কল্পনার দ্বারা এমন একটি অবস্থাকে আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়বস্তু ব'লে ধ'রে নিতে পারি; কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে মানব-ইতিহাসের যে অধ্যায়টি রচিত হচ্ছে—তার গুরুত্ব অনুসারে এই প্রকার কল্পনাকে কখনই আমরা বিস্ময়ের বা প্রশংসার চক্ষে দেখতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস মানুষের এই নিদারুণ দুর্গতি ও তজ্জনিত অধঃপতনের মধ্যেও মানুষ "জ্ঞানই ধর্ম" মহামতি সক্রেটিসের এই উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে চলবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের হিসাব নিকাশে বর্তমান মানুষের ক্ষতি অপেক্ষা লাভের অঙ্কই আমাদের আগামীকালের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমাদের বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই :—

জীবনের সমস্যাকে যদি আমরা অর্থাৎ লেখকেরা আরও জটিল করে পাঠকের চোখের সম্মুখে উপস্থিত করি তা হলে তাতে আমাদের অক্ষমতাই প্রকাশ পাবে। বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে তার মন্দটাই শুধু দেখব, ভালটা বিবেচনা বুদ্ধির অতীত হয়ে থাকবে এমন দুর্ভাগ্য যেন কোনও লেখকেরই না হয়। অন্ধকার পথে আলোর শিখাটুকু যদি ধরতে না পারি তা হলে ভীষণ অন্ধকার বলে ভয় দেখাবার কাজ আর যাদেরই হোক না কেন, কবি বা সাহিত্যিকদের কখনই নয়। উক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করে আমরা এই মহৎ সত্যকে চোখের সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। কবি-মানসে এই সত্য বিধৃত আছে। শুধু আমরা আজ পরিবর্তিত সমাজ পরিবেশের দোহাই দিয়ে শয়তানের পূজাকেই ইষ্টদেবতার পূজা বলে মনে করছি।

আমরা এপর্যন্ত যা বলেছি সেটা আমাদের মূল বক্তব্যের ভূমিকা মাত্র। আজকাল "সমাজ-সচেতন" কথাটি খুব হালকা ভাবে অথচ প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হতে শোনা যায়—মানুষ নিয়েই সমাজ—সেই সমাজ সম্পর্কে সচেতন না হলে কি কাব্য, কি উপন্যাস, কি নাটক কিছুই রচিত হতে পারে না। তবে সমাজকে দেখার ভঙ্গিটা নির্ভর করে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত মননশীলতা ও উপলব্ধির উপর। সংবেদনশীল মন সর্বদা সক্রিয় কিন্তু তার প্রতিফলনের প্রকার ভেদ আছে—রচনায় তার প্রভাব পাঠকমনে কি ভাবে সঞ্চারিত হয়

—সেটাই বিবেচনার বিষয়। যে প্রকার সাহিত্য রচনার উল্লেখ পূর্বে করেছি তার মধ্যে মনুষ্যসমাজের বিকৃত রূপটি তুলে ধরা হয়েছে। তা' হামেশা আমাদের চোখে পড়ে না—অথচ তার দিকে তাকিয়ে আমরা যদি সুলভ ইন্দ্রিয় বৃত্তির আকর্ষণে তার তারিফ করি তাহলে বুঝতে হবে আমাদের রসগ্রহণের শক্তির সত্যই অভাব ঘটেছে ;—কেন না সাহিত্য বা কাব্যের রস গ্রহণ বা পরিবেশন অনায়াস লভ্য নয়—সুসংস্কৃত পরিমার্জিত মনে রুচির প্রকার ভেদ এমন সহসা ঘটে না—ঘটেনা বলেই এখানে সমাজ-সচেতন সাহিত্যের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার কথা ওঠে।

মানুষের জীবনে স্খলন পতন ঘটে—তার জন্য পরিবেশ যেমন দায়ী তেমনি দায়ী মানুষের নিজের চরিত্র। পতিত ও অধঃপতিত বলেই যে মানুষ তার স্বস্থান থেকে অধিকার চ্যুত হবে এমন কথা সাহিত্যের কথা নয়—সমাজ-সচেতন সাহিত্যের তো নয়ই। চরিত্রবিচ্যুত মানুষের নিরাবরণ ছবি আঁকেন সাহিত্য-শিল্পী কিন্তু তাঁর লেখনীতে যদি কেবল ক্লেদপঙ্কের বুদ্‌বুদ উঠে' নির্মল জলাশয়কে দূষিত ও পঙ্কিল করে তোলে, তাহলে সে জলে মানুষের তৃষ্ণা মেটা তো দূরের কথা তার দুর্গন্ধ বাষ্পকে মানুষ পরিহার করেই চলবে। আলডুস্ হাক্সলি যত বড় চিন্তাশীল সাহিত্যিকই হোন না কেন—তাঁর ছবি দেখে এক শ্রেণীর মানুষ একপ্রকারের আমোদে উন্মত্ত হয়ে অন্ধকার প্রেক্ষা-গৃহে হয়তো সঙ্গীদের সঙ্গে গা টেপাটেপি করবে কিন্তু তার মধ্যকার তথাকথিত সমাজ-সচেতন মনের অপচ্ছায়ায় তাদের স্থির ও শুভবুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে পড়বে। সমাজের দিক থেকে এটা মোটেই শুভ নয়।

সমাজ-সচেতন মনের দোহাই দিয়ে অনেক 'রসাল' (?) অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় 'বিশুদ্ধ জারক রসে জারিত' তথা কথিত আধুনিক সাহিত্যকে খাঁকৃতির বাজারে পাচার করা হয়ে থাকে—তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে ভাবপ্রবণ সুকুমার মন তাতে কলুষিত হয়ে পড়ছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষ—তা সে যুদ্ধ জীবনের যুদ্ধই হোক আর রাষ্ট্রবিপ্লবের যুদ্ধই হোক, তার সমস্ত চিত্ত-বিক্ষোভ ও অসন্তোষ এবং ব্যর্থতা নিয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়াবে সুলভ ও সহজ চিত্তবিনোদনের উপকরণের মধ্যে। তাতে প্রবৃত্তির বিকৃত ও অসম্বৃত আকর্ষণই জয়ী হবে, শুভবুদ্ধি হবে উপেক্ষিত। সমাজ-সচেতন সাহিত্যের

গুরুদায়িত্ব তো এইখানেই—সে কি ইন্ধন জুগিয়ে যাবে—জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতির মতো ?

উচ্চস্তরে পৌঁছে যাঁরা বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হয়েছেন—তাঁদের রচনায় প্রাচীন ও একালীন সমাজের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে ; মানুষের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খা, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য, আনন্দ ও নিরানন্দ, সেই সঙ্গে তার দুর্বলতা স্খলন পতন ত্রুটি বিচ্যুতিও তাতে অপকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—এবং কোনও মার্কামারা দলের ছাপ তাতে পড়েনি বলেই আর্টের ধর্ম বজায় আছে। তাঁদের সমাজ সম্পর্কে চেতনা অতি স্বাভাবিক এবং অকৃত্রিম বলেই তাঁরা 'সমাজ-সচেতন' ব'লে নিজেদের জাহির করার প্রয়োজনবোধ করেননি। কিন্তু যাঁরা নূতনত্বের মোহে মানুষের অতীতকে উপেক্ষা করেন, বর্তমানকে ইচ্ছা করেই তা'র অন্ধকার গলি ঘুঁজি থেকে বের করে কালিমালিপ্ত রূপে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন, তাঁরা জানেন সে কালিমা ক্লেদ-পঙ্কের—তা'তে পঙ্কজের শোভাও নেই—সুগন্ধও নেই—পঙ্কতিলকের জয়গান করেন তাঁরা চমক লাগাবার জন্য ;—অথচ তাঁরা বৃহত্তর মানবিকতার প্রশ্নকে এড়িয়ে যান। সমাজের প্রতি এ দরদ নয়, নির্মম অবিচার। অতএব নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধিতে সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় আমাদের এ উক্তি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

এটা অবশ্য খুবই আশার কথা যে মধ্যবিত্ত বা ধনিক সমাজের অবসিত মহিমার ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকলেও বিকাশ ও সম্প্রসারণের যুগ আরম্ভ হয়েছে জনসাধারণকে নিয়ে,—যারা এতদিন অবজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল আমাদের সাহিত্যে আজ তাদের সম্বন্ধে চেতনার উন্মেষ দেখা দিয়েছে। এতে ক'রে আমাদের সাহিত্য মুক্তি পাবে এক প্রশস্ত ও ব্যাপক রচনার ক্ষেত্রে। তাই, যদি আজ আধুনিক সাহিত্যকে জাতির নিম্নতন স্তরের ক্ষয়িষ্ণুতার বিপক্ষে দাঁড়াতে দেখতাম তাহলে বুঝতাম সত্যই একটা নূতন যুগের আবির্ভাব আসন্ন। কিন্তু সেই যুগ সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সাহিত্যসৃষ্টি আনন্দলোকে নিজেকে বিস্তৃত করে দেয়—অকুণ্ঠিত দানে, সে সৃষ্টি একটি অনন্যসাধরণ মহিমায় কালের কষ্টিপাথরে তার যে পরীক্ষোত্তীর্ণ দাগটি রেখে দেয়—তাই দিয়েই

হয় তার মূল্যায়ন। তাতে অভিনবত্ব থাকে কিন্তু থাকে না অতিসুলভ যৌন আবেদন অথবা কামায়ন গানের ইঙ্গিতসর্বস্ব অঙ্গভঙ্গী ও অশোভন প্রগলভতা ; শ্রেণীবিশেষের প্রতি অকরুণ বিমুখতায় সে সৃষ্টি স্পর্ধিত আত্মপ্রশংসায় মুখর নয়। টেক্‌নিক ও আঙ্গিকের কৌশল কাব্য বা উপন্যাসের শেষ কথা নয় চরম কথাতো নয়ই—কেবল সামাজিক দৃষ্টিতে এর বিচারও অভ্রান্ত হতে পারে না। কথা হচ্ছে এই যে নূতন যুগের হাওয়ায় দেহ জুড়ায় কিনা, আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় মনের অপ্রবুদ্ধ অনুভূতি জেগে ওঠে কিনা, তার আলোকোজ্জ্বল ব্যপ্তিতে মনের অন্ধকার কক্ষেও আলোর অবারিত খেলা দেখতে পাওয়া যায় কি না। সমাজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রাচীন সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করে' সামাজিক বিবর্তনের পরিণাম ফলকে অতি প্রশংসা করার মধ্যে আধুনিকতা থাকতে পারে কিন্তু সমাজ-ধর্মের অলঙ্ঘনীয় দণ্ডকে তাতে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আসল কথা হচ্ছে মানুষের প্রতি দরদের কথা, সে দরদ অবশ্যই বস্তুনিরপেক্ষ নয়, বস্তুসর্বস্বও নয়,—অন্তর্মুখীন মনের মণিকোঠায় যে রস ও আনন্দ উৎসারিত হয়ে ওঠে—সার্থকনামা কবি বা ঔপন্যাসিক সেই রস ও আনন্দ পরিবেশন করে থাকেন আমাদের চিত্তলোকে—চিরকালের এই সত্য তথাকথিত সমাজ-সচেতন সাহিত্যের স্তুতিবাদে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনেকেই মনে করেন যে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি আজ সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ; কথাটা মিথ্যা নয়। আমাদের যুগটাই এমন যে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের সমাজকে—অতএব সংস্কৃতি ও সাহিত্যকেও। এ পরিবর্তনের গতি এতই দ্রুত যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা মুস্কিল হয়ে পড়ছে। তবু আকস্মিক হলেও যা' অবশ্যম্ভাবী তাকে এড়িয়ে যাওয়া কোনও জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়—এবং উচিতও নয়। সমাজ ও সংস্কৃতির উপর পরিবর্তনের প্রভাব যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি প্রত্যক্ষ সাহিত্যের উপরও। যেখানে অপেক্ষা করার সময় নেই, সুযোগও নেই সেখানে মানুষকে চলতেই হয়—কিন্তু তাতে আসল লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তি আসা স্বাভাবিক ; চলতে চলতে মানুষের পাথেয় যখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে তখনই আসে যাত্রাপথের সঙ্কট—সে সঙ্কটে "যাহা পাই তাহা ঘরে লয়ে যাই", যার মূল্য অকিঞ্চিৎকর ও স্বল্পকালস্থায়ী তাকে মহামূল্যবান ও চিরকালের সম্পদ বলে ভুল করি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

সেকালের আলোচনা প্রসঙ্গে খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ তাঁর "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে বলেছেন যে তখন "শহর বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, তার বিচিত্র সভ্যতা, তার আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা চালচলন, আলাদা সমাজব্যবস্থা, আলাদা অর্থনৈতিক কাঠামো—এসব্ কিছুই ছিল না। সে শহর থেকে ঐ সব বিশেষ লক্ষণান্বিত চিন্তাধারাও গ্রামে প্রবেশ ক'রে তার সমাজ ও জীবনকে পর্যুদস্ত করেনি। এক কথায় urban centres হয়ত ছিল, কিন্তু urban civilization-এর চিহ্ন মাত্র ছিল না।"

"ইংরেজ আমলে সবই গেল বদলে। শুরু হল urban civilization। কালচারের কেন্দ্র নবদ্বীপ হতে সরতে সরতে ভাটপাড়া হয়ে শেষ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হ'ল শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের ছত্রছায়ায়, অধিষ্ঠিত হ'ল বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তারপর ক্রমে ক্রমে হিন্দু কলেজ

ও বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল। কালে কালে তা' বর্তমান চেহারায় পৌঁছেছে। গ্রামের কর্তা ব্যক্তিরা সব শহরমুখীন হয়েছেন, তাঁদের উৎসব-আনন্দের সামাজিকতার সঙ্গে গ্রামের আর কোন যোগ নেই। তাঁরা গ্রাম বন্ধনের বাইরে চলে গিয়েছেন— বরং সহঁর আর গ্রাম এখন পরস্পরের পরিপূরক নয়, পরস্পরের বিরোধী। কালচারও আলাদা হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে দেখা গেল কতকগুলি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যাদের কোন যোগই নেই গ্রামের সঙ্গে বা গ্রামীন সমাজের সঙ্গে। যেমন ইয়ং বেঙ্গল দল বা পরেকার ইঙ্গবঙ্গ বিলেত ফেরত সম্প্রদায়। এঁরা বঙ্গ সংস্কৃতির শহুরে শাখাচারী। কিন্তু এঁদের নয়নশোভন চাকচিক্য তো বটেই, সেইসঙ্গে এঁদের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারা ও সজীব সভ্যতার বেগবান প্রবাহকে আমাদের জীর্ণ আচারের ঠুন্‌কো বেড়া ঠেকাতে পারল না, আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। ফলে তফাত আরও বাড়ল, সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াল নিছক মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি।

"পশ্চিমী সভ্যতা ও আর্থিক অবস্থার আলোড়নে এদেশে যে সমুদ্র মন্থন হতে লাগল তাতে আর কিছু উঠুক নাই উঠুক, সকলের চোখ ঝলসিয়ে দিয়ে উঠল বাংলা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। প্রত্যেক দেশেই বুদ্ধিজীবীর দল সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হতেই উদ্ভূত,—সমাজ নেতৃত্ব, অর্থাৎ চিন্তাজগতের নেতৃত্বও বেশির ভাগ সময়েই তাদেরই হাতে থাকে। এ হল প্রায় সর্বজাগতিক সত্য।"

তাতে কিছু এসে যেত না কিন্তু "এখানকার বিশেষত্ব হল এই যে—এখানে মধ্যবিত্ত ছাড়া আর কিছু ছিল না, গড়ল না।" ইংরেজী শিক্ষার মারফত নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পেয়ে দীপ্ত চিত্তের মুক্ত বাণীর আস্বাদ লাভ করে এই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ মনের ক্ষেত্রে যে অপরূপ সোনার ফসল ফলিয়েছে তার তুলনা নেই! স্বল্প সময়ে এত অত্যুজ্জ্বল কাব্য সাহিত্য, দর্শন ভাষা সৃষ্টি করা অন্যত্র কোথাও সম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। * * * কিন্তু এই অপূর্ব ও অত্যুজ্জ্বল সংস্কৃতি ও সাহিত্যের রসবেত্তা এবং উপভোক্তা নিতান্তই সীমাবদ্ধ, সমগ্র সমাজে তার রসাস্বাদন ব্যাপকভাবে নেই। পূর্বে

এইটি ছিল না। তখনকার সাহিত্য এত উঁচু দরের ছিল না নিশ্চয়ই—কিন্তু সে সাহিত্যরস আস্বাদন করত সমাজের এক বিপুল অংশ—তখন পাঠকদের মধ্যে এমন শ্রেণীবিন্যাস হয়নি।* * * পূর্বে সংস্কৃতির বিকাশ ছিল কম ব্যাপকতা ছিল বেশি, তার উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পাশে পাশে একটি বিরাট ও বিপুল লোক সংস্কৃতির ধারা সমাজের সকল স্তরকে সজীব এবং সরস রাখছিল। এখন এ সবের অন্তর্ঘটনা বিকাশ হল আশ্চর্য কিন্তু ব্যাপকতা গেল কমে।" পূর্বেই বলেছি, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই এ পর্যন্ত অগ্রণী হয়ে এসেছে।* * * কিন্তু আজ শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা জগতেই মধ্যবিত্তের অন্তিম দিন মোটামুটি ঘনিয়ে এসেছে। * * * সুতরাং এ যুগে সমাজ বাঁচিয়ে রেখে নব নব সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন করতে গেলে বহুর চিত্তে সংস্কৃতির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন।"

পরবর্তী আলোচনায় যা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এই যে যখন সংস্কৃতির বিকাশের পরিবেশ এ নয় তখন সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতির সহায়তা করতে গেলে "প্রথমতঃ চাই সুস্থ সামাজিক পরিবেশ, দ্বিতীয়তঃ চাই শিক্ষার প্রকৃত বিকীরণ।" "সর্বদা বাইরের পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়ার অস্বস্তিকর অবস্থা হতে পরিত্রাণ"—তার জন্য চাই সামাজিক মুক্তি। তারই অভাব আছে বলেই অর্থাৎ সংঘর্ষ রয়েছে বলেই "অনেক সময় কাব্যে সাহিত্যে এবং শিল্পে দুর্বোধ্যতার এত ছড়াছড়ি; obscurantism প্রায় একটা আদর্শ হিসাবে পূজা করা হচ্ছে, তার পিছনে সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছুই নেই। বাইরের পরিবেশ যখন অস্বস্তিকর, সংঘর্ষ যখন পদে পদে, সে সময় মন বহির্মুখী হতে চায় না, ভিতরে লুকিয়ে পড়ে, বড় জোর সৃষ্টি করে আমি-ময় কাব্য, আনন্দ পায় দুরূহতায়। সৃষ্টির প্রধান কার্যই হল একের কথা অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করা, তার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল প্রকাশিত হওয়া। কিন্তু এখন পাঠক সমাজকে আনন্দের অংশীদার করবার জন্য কাব্য রচনা করা হয় না, সৃষ্টির প্রধান কার্যকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা চলতে থাকে পদে পদে। যেন আমি যা ভেবেছি যা লিখেছি আমার জন্য তাই যথেষ্ট, অন্য লোকে সে আনন্দ অনুভব করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় না। অ্যাবষ্ট্রাক্‌শন খুব ভাল জিনিষ, যতক্ষণ তা ইঙ্গিতের ভরে দর্শক পাঠকের

মনকে নানা রসে উদ্রিক্ত করতে পারে। কিন্তু সেটা পারা চাই। কাব্য সাহিত্য বাক্রোক্তি-জীবিত তো নিশ্চয়ই কিন্তু সে বক্রোক্তি ততক্ষণই গুণ যতক্ষণ সে ধ্বনির সহায়ক, ব্যঙ্গার্থের উদ্দীপক। কিন্তু যদি সেই বক্রোক্তি দুরুহতার এমন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে সময় কবির ইশারা পাঠক ধরতেই পারেন না, গবেষণা করতেই সময় কেটে যায়, পাঠকের সঙ্গে লেখকের উদ্রিক্ত রসের ভূমিতে একাত্মতা হবার উপায় থাকে না, সেখানে আর যাই হোক রস সৃষ্টি হয় না—মহৎ সাহিত্য তো নয়ই। মহৎ সাহিত্য তো এইজন্যই চিরকাল কমবেশি—elemental আচারের বেড়াজালে বদ্ধ সূক্ষ্ম তার্কিক বা শ্রেণীসংঘর্ষে দিকভ্রান্ত ত্রস্ত পলায়নী মানুষ দিয়ে সৃষ্টি হয়নি—কখনও মহৎ সভ্যতা বা সংস্কৃতিরও সৃষ্টি হয়নি। তারজন্য সজীব বলিষ্ঠ মন ও প্রসরণশীল সমাজ চাই। এইজন্যই সংস্কৃতির বিকাশও প্রসারের জন্য চাই সামাজিক মুক্তি। * * * এমন সমাজ চাই যার ভবিষ্যৎ আছে, জীবনে আনন্দ আছে, ভবিষ্যতের আশা আছে। এই পরিবেশেই বলিষ্ঠ মানুষ তৈরী হয়, জীবনে গান আসে, নতুন সংস্কৃতি রচিত হতে থাকে, সমাজ এগোতে পারে।”

এই বিস্তৃত উদ্ধরণের জন্য লেখকের কাছে ঋণ স্বীকার করে একথা বলা আবশ্যক যে এর দুটি কারণ আছে : প্রথমতঃ বিষয়টি এক এবং অভিন্ন ; দ্বিতীয়তঃ চিন্তাধারা, দৃষ্টি-ভঙ্গি ও বক্তব্যের দিক থেকে উভয় আলোচনার মধ্যে মূলগত ঐক্য রয়েছে।

এর আর একটি দিক আছে—সেটি তত্ত্ব বা দর্শনের দিক। এ বিষয়ে প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় কোনও একটি সংস্কৃতি সম্মেলনে যে আলোচনা করেছিলেন তার মূল কথাগুলি আমাদের এ বক্তব্য সম্পর্কে খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন যে আমাদের নূতন কালের যাত্রারম্ভের প্রথম প্রহরে পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে এসেছে, আসছে প্রচণ্ড জলোচ্ছাসের মতো আঘাত। ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রাণ-ধর্মকে বিপর্যস্ত করে তুলতে চাইছে, তাকে হতচেতন করে নূতন দাসত্বে শৃঙ্খলিত করতে চাইছে! দিকে দিকে আজ চিৎকার উঠছে—পৃথিবী নাকি আজ দুটি শিবিরে বিভক্ত এবং এই দুই

শিবিরের এক শিবিরে ভারতবর্ষকে নাকি আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে। ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে তারা স্বীকার করে না। অথচ ভারতবর্ষ আবহমান কালের এক স্বতন্ত্র শিবির। শান্তির শিবির। সমন্বয়ের শিবির। হিংসা ও যুদ্ধ-জর্জর পৃথিবীর সান্ত্বনা-শিশির। ভারতবর্ষের এই স্বতন্ত্র সত্তার বিলুপ্তি আজ নাকি ইতিহাসের দাবি। এ দাবি বাইরের পৃথিবী থেকে আমরা দু'হাজার বছর ধরে শুনে আসছি, সে দাবির আঘাত সহ্য করে আসছি। গ্রীক এসেছে, শক হুন মোগলপাঠানের স্পর্ধিত অভিযান ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি! তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থেকে, তার "প্রাণধর্ম" থেকে তাকে বিচ্যুত করবার জন্য বার বার চেষ্টা করা হয়েছে— কিন্তু পরাজিত হয়েও ভারতবর্ষ রাজকর দিয়েছে কিন্তু নিজের সত্তা ও সাধনার ধারা থেকে কখনও কোনও উৎপীড়নেই সে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত হয়নি। সে প্রাণধর্ম কি? যে প্রাণধর্ম অলুব্ধ, সে প্রাণধর্ম নম্র। কিন্তু নম্র হয়েও সে সুদৃঢ়, শান্ত হয়েও সে নির্ভয়। যে মহা সত্যের তপস্যায় সে নিমগ্নপ্রাণ, তা' জৈব ধর্মের অতীত, আর সে তপস্যা হিংসাকে অতিক্রম করার তপস্যা! তারাশঙ্করের এ উপলব্ধি সত্যাশ্রয়ী, তাঁর যুক্তিও ইতিহাস সম্মত। তিনি সত্যের প্রতি মর্যাদাবোধে বলেছেন যে ভারতবর্ষ মৈত্রী ও মিলনের মধ্যেই মানব-ধর্মের উদ্‌যাপন করতে চেয়েছে। সেই কারণেই তার সাধনার ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ পৃথিবীতে চিরদিন মহামানবতার তীর্থ ভূমি, বহুমুখা সাধন-ধারার একমুখী সমন্বয়ের একমাত্র শিবির। এ উপলব্ধি ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে দৃঢ়সংকল্প সাধকের উপলব্ধি। এ শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর কথা মালা নয়, উপন্যাসিকের বাক্যবিন্যাস বা ঘটনা-সংঘাত সৃষ্টি করবার কুশলতা নয়, এ আত্মরক্ষা ও আত্মানুশীলনে সাহিত্যসমাজকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সাহিত্য-তীর্থের সহযাত্রীর আহ্বান। তিনি বলেছেন, সংকটময় দুর্যোগের কথা স্মরণ করে আশাভরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য, আত্মবিস্মৃতি হতে জাগ্রত হওয়ার জন্য আমাদের চিত্তকে প্রস্তুত করতে হবে। সেদিনও ভারতবর্ষের প্রাণ-পুরুষ জাগ্রত হয়েছিলেন, চিরদিনের শুদ্ধাচারী তপস্বী, জীবনবিশ্বাসী রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে—।

মুক্তির নামে, স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে সমগ্র উত্তর পুরুষকে বিনষ্ট ও মতিহীন করতে আজ যারা বদ্ধপরিকর, সাহিত্যে শিল্পে যারা সঞ্চারিত করতে চাইছে নাস্তিক্য বুদ্ধি, উগ্র হিংসাবাদের নিছক জৈব প্রবৃত্তি, সুদীর্ঘ কালের সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ টানতে যারা আজ উদ্যত, সত্য বলে ঘোষণা করতে চায় যারা জৈব ধর্মের ক্রোধ হিংসা লোভ, বিকারগ্রস্ত মন নিয়ে যারা আজ সুন্দর ও মঙ্গলের আশ্রয় সাহিত্যকে করে তুলতে চাইছে হিংসা চরিতার্থতার হাতিয়ার, তাদের সাবধান ক'রে দিয়ে তারাশঙ্কর শুনিয়েছেন আশার কথা। তিনি বলেছেন, "দেশের মহত্তম মনে যে সুস্থসুন্দর নির্ভয় সমাজের মূর্তি পরিগ্রহ করবে কল্পনায়, কর্মীর সাধনায়, তা বলবান হয়ে উঠবে শহরে গ্রামে, শস্যক্ষেত্রে, খনিতে কারখানায়, পণ্যশালায়—আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য-সুন্দর, কল্যাণ-পরিশুদ্ধ অন্তর, শিক্ষায় উজ্জ্বল দৃষ্টি মানুষের শ্রেণীহীন, বর্ণ বৈষম্যহীন সাম্যের সন্তোষে শান্তিময় সমাজ গড়ে উঠ্‌বে সেই কল্পনায়, সেই কর্মে। ভবিষ্যতের কবি রচনা করবেন এই নূতন জীবন এবং নূতন সমাজ নিয়ে নব মহাভারত।"

এরূপ রচনার প্রয়োজন এই মুহূর্তের। এখনি আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু এই মহৎ চেষ্টার নেতৃত্ব করবে কে? যার হৃদয় আছে, অনুভূতি ও উপলব্ধির গভীরতা আছে, আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবার মতো সাহস ও শক্তি আছে, সর্বোপরি আত্মপ্রত্যয় আছে, তিনিই অবশ্য নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি। আমাদের সাহিত্য-সমাজে সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের মধ্যে সেরূপ যোগ্য ব্যক্তির কি অভাব আছে? সংখ্যায় বহু না হ'লেও—হয়তো বা একজন বা একাধিক ব্যক্তি সে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন বলেই আমাদের ধারণা। শুধু সাহিত্যিক খ্যাতির উচ্চ শিখরে সমাসীন বলেই নয়—মানবতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ, ধর্ম ও ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরতা, বহু বিচিত্র মর্ত্য জীবনের প্রতি সহধর্মিতা ও সহমর্মিতা আছে এমন সাহিত্যিক কি সত্যই বাংলা দেশে নেই? নিশ্চয়ই আছে—। যে বাণী মনুষ্যজীবনের চিরন্তন সম্পদ, যে বাণী সর্বলোকে সর্বকালে তার পরমার্থ বহন করে চলে, সেই বাণী কি আমরা কারো কাছ থেকে শুনতে পাই নি—? এমন কুশলী শিল্পী কি আমাদের চোখে পড়েনি যিনি তাঁর

ধ্যাননিষ্ঠ, আত্মিক চেতনালব্ধ প্রাণশক্তির দ্বারা মানসপ্রতিমা গড়ে তুলেছেন—তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, কণ্ঠে ভাষা দিয়েছেন, মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, নিজের অন্তরবেদনার অশ্রুতে সেই প্রতিমার চক্ষেও অশ্রু বর্ষণ করিয়েছেন? আহ্বান করি তাঁকে আমাদের মধ্যে—যিনি তাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্যে, ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে বাংলার সাহিত্যসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।

লেখক ও সমালোচক

বাংলা ভাষায় একটি "সর্বাবয়বসম্পন্ন সমালোচনা-সাহিত্যের স্থষ্টি" করার উদ্দেশ্যে, সন ১২৯০ সালের ফাল্গুন মাসে বাংলার বাহিরে স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় "আপিসের কয়েকটি কেরানী" লইয়া "পাক্ষিক সমালোচক" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়—"তখন বঙ্কিমবাবু বহু পূর্বেই "বঙ্গদর্শন" হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের তখন বিষম বিপন্নাবস্থা। "আর্য্যদর্শন" একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। "বান্ধব" কখনও বাহির হয়; কখনও বা হয় না। কালে ভদ্রেই লোকে তাহা দেখিতে পায়। "বান্ধব"-সম্পাদক বাঙ্গলার এমার্সনাখ্য কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখনীও তখন ক্রমে খর্ব্বশক্তি হইয়া পড়িতেছে। "ভারতী" তখন বয়ঃক্রমের অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। উহা "ভারতী" সম্পাদক পরিবর্ত্তনের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী কাল। উহার কিছুকাল পরেই, বোধহয়, ১২৯১ সালের প্রথম মাসে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাবু "ভারতী"র সম্পাদনকার্য্য এখনকার সম্মানীয়া সম্পাদিকার* হস্তে অর্পণ করেন। তখনও "নবজীবন" ও "প্রচার" ভবিষ্যতের ভ্রূণাভ্যন্তরস্থিত। "পাক্ষিক" প্রকাশিত হইবার পরবর্ত্তী শ্রাবণ মাসে "নবজীবন" ও "প্রচার" প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপতঃ বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের তখনকার অবস্থা এই।"

সমসাময়িক এতগুলি পত্রিকার প্রতিযোগিতার মধ্যে 'সমালোচক" প্রকাশিত হলেও তাতে তার কোনও ক্ষতি হয় নি বরং পাক্ষিকটি তার "আত্ম-আবশ্যকতা প্রতিপন্নও" করেছিল। ঠাকুরদাস বাবুর কথাতেই আমরা জানতে পারি যে "সেরূপ আকৃতির ও প্রকৃতির পাক্ষিক পত্র এ দেশে তাহার পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই"। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে সাহিত্য সমালোচনার এই পত্রিকাখানিই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের প্রথম প্রকাশন।

* স্বর্ণকুমারী দেবী

রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাখানিকে "ভুঁইফোঁড় পত্র" বলে সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তখন অল্পবয়স্ক হলেও তখনই "সাহিত্যক্ষেত্রে স্বকীয় প্রতিভার সবিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত করিতেছিলেন।" বঙ্কিমবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির রচনার সমালোচনা এতে প্রকাশিত হ'ত। রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি "সমালোচক" সম্পাদকের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন—"প্রায় বঙ্কিমবাবুরই লেখার মত রবীন্দ্রবাবুর রচনা পড়িতে আমি ভালবাসিতাম। কেবল তাঁহার কবিতা বলিয়া নয়, তাঁহার গদ্য প্রবন্ধ ও সমালোচনা আমাকে সবিশেষ আমোদিত করিত। এজন্য তিনি তখন যেখানে যাহা কিছু লিখিতেন তাহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম। তাঁহার লেখায় আমার এত আমোদ ও ব্যগ্রতার কয়েকটি কারণ ছিল। এখনও অবশ্য আছে। প্রথমতঃ তাহাতে আমার কেমন একটু অনির্ব্বচনীয় আরামের উদ্রেক হইত, দ্বিতীয়তঃ তাহাতে ভাবিবার বস্তু থাকিত ; এবং সর্ব্বোপরি তাহাতে বেশ দু'কথা বলিবার বিষয় পাইতাম। * * * ইহাও আমি বলিতে বাধ্য যে, ঐ সকল সমালোচনায় আমার একটি অবিমিশ্র সাহিত্যামোদ ও সমালোচ্য ব্যক্তি ও বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ব্যতীত অসূয়ার লেশমাত্র ছিল না। তাহার কিছুমাত্র কারণেরও অভাব ছিল। ফলতঃ সাহিত্য সমালোচনায় যাঁহারা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সংযুক্ত করেন তাঁহারা কেবল সাহিত্যামোদে একান্ত বঞ্চিত নহেন, সেটি তাঁহাদের একটি সাংঘাতিক ভ্রম।'

সমালোচনার মূল নীতি ও আদর্শ কি হওয়া উচিত এ থেকে তার অনেকটা নির্দেশ পাওয়া যায়।

আমরা একথা বলি না যে এই নির্দেশই সমালোচনার একমাত্র নির্দেশ। এখানে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা প্রবর্তনের প্রারম্ভিক ইতিহাসটুকুর মধ্যে এই নির্দেশের উল্লেখে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে সাহিত্যে সমালোচনার প্রকৃতি অবস্থান্তরে পরিবর্তনের দিকে আজ উন্মুখ হলেও তার তাৎপর্য সমানই রয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের কোনও একটি রচনার সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তার

প্রতিবাদ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রুটি প্রদর্শন করেন—তাতে বঙ্কিমচন্দ্র তার কড়া উত্তরে বলেছিলেন, রবিবাবু যখন ক খ পড়েন তখন থেকেই লেখকের (অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের) এ ত্রুটি ঘটে আসছে। কিন্তু এহ বাহ্য—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল—এবং বাংলা সাহিত্যে ভাবীকালের অবিসম্বাদিত খ্যাতি ও সম্মানের আসন যে রবীন্দ্রনাথের জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা' প্রতিভাত হয়েছিল—তাই একদিন তিনি কোনও একটি বিবাহ সভার প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে নিজ কণ্ঠের পুষ্পমাল্য স্মিত হাস্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিলেন। বিরুদ্ধ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে আমরা আজকাল যেমন অন্তরে আজীবন অসন্তোষ পোষণ করে থাকি তখনকার দিনে এমন ঘটত না। ঘটত না বলেই আমরা একই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দীপ্তিতে সাহিত্যসমাজকে আলোকিত হতে দেখেছি। তখনকার দিনে ব্যক্তিগত সাহিত্যিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল অন্যরূপ।

শুধু সাহিত্য কেন, সব কিছুর সমালোচনাকেই দুই ভাবে বিভক্ত করতে পারা যায়, যথা ঃ গঠনমূলক ও ধ্বংসমূলক। প্রথম প্রকারের সমালোচনা গঠনের কাজে অর্থাৎ সুন্দর কিছু, শ্রেয় ও প্রেয় কিছু গড়ে তোলবার কাজে সহায়তা করে এবং দ্বিতীয় প্রকারের সমালোচনা, যেটুকু হয়েছে সেটুকুও ধ্বংসের পথে আগিয়ে দেয়। এটা আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে কিছুকাল পূর্বেও দেখেছি—এখনও দেখছি।

কোনও রচনা সম্পর্কে যখন আমরা সমালোচনা করি তখন আসল বস্তুটিকে আর রাখি না—হয় অতি প্রশংসার জন্য তা নিকৃষ্ট হয়েও পাঠকের কাছে উৎকৃষ্ট বলে অনুমিত হয়, নতুবা তাকে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টায় তা' অপাঠ্য বলে মনে হয় এবং সেটা বর্জন করবার পক্ষে মনের মধ্যে যুক্তিতর্ক চলতে থাকে। কি প্রকারে আলোচ্য রচনাটি সমালোচনায় উত্তীর্ণ হয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পর্য্যায়ে উঠতে পারে—তার কোনও নির্দেশ, ইঙ্গিত বা আভাস না থাকলে সে সমালোচনাকে আমরা বলি ধ্বংসাত্মক এবং তার দ্বারা সমালোচক নিজেই নিজেকে খাটো করেন মনে করলে খুব অপরাধ করা হয় না। এমন খুব কম সাহিত্যিকই আছেন যাঁরা তাঁদের রচনার গঠনমূলক সমালোচনাকে

নিজেদের মহত্ত্ব দ্বারা স্বীকার করে নিয়ে রচনাবলীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হন—কোনও রচনার বিরবচ্ছিন্ন ও অপরিমিত বিরুদ্ধ সমালোচনা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবার মত সাহিত্যিকও নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে সমালোচনার লক্ষ্য কি—সাহিত্যিক তার আভাস না পেলেও নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিতে নিজের নূতন পরিকল্পনা, উপলব্ধি ও মননশীলতার দ্বারা নিজেই তাঁর রচনাকে সত্যকার উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে থাকেন। সে স্থলে সমালোচক নিজের অক্ষমতার জন্য লেখকের কাছে ছোট হয়ে যান। ছোট হয়ে যান এই জন্য যে তিনি শুধু ধ্বংসাত্মক সমালোচনাই করেছেন—রচনার উৎকর্ষ সাধন করবার কোনও নির্দেশ বা আভাস তিনি দিতে পারেন নি—এখানে কৃতিত্বের জন্য প্রশংসার দাবী একমাত্র লেখকই করতে পারেন—সমালোচক কখনই নয়।

যিনি গঠনমূলক বা রচনাত্মক সমালোচনা করেন—লেখকের প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকে—রচনার প্রতিও থাকে তাঁর সত্যকার দরদ। তিনি বলে দেন, দেখিয়ে দেন কেমন করে আলোচ্য রচনার উৎকর্ষ সাধন করা যায়, উদাহরণ দিয়ে বলেন যে এই ভাবে ও এই ভাষায় রচনা করার রীতিই শ্রেয়স্কর। এই দিক দিয়ে সমালোচক—সাহিত্য-সৃষ্টির পথপ্রদর্শক। প্রগতিভাবাপন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই এরূপ সমালোচনার প্রশংসা করবেন, এর প্রয়োজন ও সার্থকতা স্বীকার করবেন।

"It will often build good men out of weaklings and better men out of good ones." অর্থাৎ গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা অক্ষমদের মধ্য থেকে সত্যকার ভাল মানুষ তৈরী হবে—ভাল মানুষদের মধ্য থেকে তৈরী হবে উৎকৃষ্ট মানুষ। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য, কিন্তু জ্ঞানী ছাড়া এরূপ গঠনমূলক সমালোচনা আর কেও করতে পারেন না।

আমরা বলি,—যদি শ্রেয়স্কর পথের সন্ধান না দিতে পারি তা হলে আমরা আদৌ সমালোচনা করব না—কেন না তাতে কেও না কেও ব্যথিত হবে—হয়ত বা কেও সাহিত্য কর্ম থেকে বিরত থাকবে। অক্ষম লোকের হাতে অপদার্থ সমালোচনা হতে দেখি বলেই একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে যারা

অজ্ঞ অথচ জ্ঞানের বড়াই করে, মস্তিষ্ক নাই অথচ বিদ্যাবত্তার গর্ব আছে, হিতাহিত জ্ঞান নাই অথচ লেখকের হিতসাধন করবার অহঙ্কার করে, তারা সাহিত্যের বন্ধু নয় ;—কপট বন্ধু অপেক্ষা সহজ ও প্রকাশ্য শত্রুকে বরং আমরা সমাদর করব কিন্তু তথাকথিত সাহিত্যসমালোচক মাত্রকেই আমরা সর্বতোভাবে বর্জন করতে দ্বিধাবোধ করব না।

সমালোচনার দ্বারা যদি লেখককে উন্নত পন্থায় সাহিত্যসাধনা করবার কোনও নির্দেশ দিতে না পারি, ব্যস্তসমস্ত হয়ে শুধু বাহাদুরি নেবার জন্য অথবা অসাহিত্যিক জনসাধারণের নিকট থেকে সুলভ খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভের চেষ্টায় সমালোচক হয়ে বসি তাহলে তাতে সাহিত্যের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করা হবে। সেজন্য একজন ইংরাজি সাহিত্যের সমালোচক বলেছেন—

"If I cannot build myself and other men with my criticism, I will not tear down or destroy it."

অর্থাৎ আমি যদি আমার সমালোচনার দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে তা দ্বারা আমি কোনও রচনাকে ছিন্নভিন্ন বা ধ্বংস করে ফেলব না।

সন ১৩২১ সালের সাহিত্য সম্মেলনে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক, সাহিত্যের শাশ্বত আদর্শের পূজারী, সাহিত্যরথী স্বর্গীয় শশধর রায় মহাশয় সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে সাহিত্যালোচনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন আজকার দিনেও বিশেষ ভাবে তা' প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন—"মানব-কল্যাণ সাধনই যদি যথার্থ ধর্ম্ম হয়, তবে সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যালোচনার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে; সেই আলোচনা করিতে জানিলেই হইল।" সাহিত্য আলোচনা বা সমালোচনার আসল কথাটাই হচ্ছে—"সেই আলোচনা করিতে জানিলেই হইল।"

আজকার দিনে আমাদের মধ্যে অপক্ষপাতে সত্যকার সাহিত্যালোচনা করতে পারেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা বেশি নয়। সাহিত্য সমালোচনা বা আলোচনা করবার মত বিদ্যা বুদ্ধিও সকলের নেই। গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত মনোভাব থাকলে নিরপেক্ষ ভাবে সাহিত্য সমালোচনা

করা যায়। জ্ঞান বুদ্ধি সীমাবদ্ধ হোক কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি যদি ব্যক্তিগত বিদূষণ-প্রবৃত্তির দ্বারা সংকীর্ণ না হয় তা হলে সমালোচনার জন্ত সমালোচক নিন্দাভাজন হতে পারেন না। নিজের সাহিত্যিক বুদ্ধি, সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুরাগ থাকলে সমালোচক নিজেকে নিজে যেমন মর্যাদা দেন তেমনি আলোচ্য রচনা ও রচয়িতাকেও মর্যাদা দিতে পারেন। অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও সে প্রকার সমালোচনা সাহিত্যক্ষেত্রে বর্জনীয় তো নয়ই বরং আদরণীয় হবার অধিকার রাখে।

সমালোচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংবেদনশীল মননের একান্ত প্রয়োজন আছে। সমালোচকের স্বধর্মে (এখানে ধর্ম religion অর্থে ব্যবহৃত হয় নি) নিষ্ঠা থাকবে, দেশের সাহিত্য-কর্মের প্রতি যথেষ্ট মর্যাদাবোধ থাকবে—প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের পূর্বাপর ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে—দলীয় মনোভাবের প্রতি অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ও উপেক্ষা থাকবে, ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা থাকবে এবং কোন একটি বিশেষ ভাব ধারণা, আদর্শ ও রুচির প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব বা আসক্তি থাকবে না—তবেই আমরা বলব সাহিত্যের আলোচনা বা সমালোচনা করবার যোগ্যতা ও অধিকার তাঁর আছে।

শশধর বাবু ৪৫ বৎসর আগে তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যা বলেছিলেন—আজকার দিনে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি বলেই এখানে তাঁর কথার উল্লেখ করা গেল। অবশ্য একালীন সাহিত্যিক বা পাঠক শশধর রায়কে চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না—কারণ তাঁদের কাছে পূর্বকথিত "স্বধর্মের" কোনও বালাই নেই—তাঁদের কাছে আজ বিশেষভাবে পরিচিত এলিয়ট, ওয়েলস্, শ্য, অ্যালডুস্ হাক্সলি, এজরা পাউণ্ড গিবসন্, গর্কি, আঁদ্রেজিদ, কার্লমার্কস্—। তাঁরা ব্রাডলে বা র‍্যলেকেও চেনেন না। আজ তাঁরা মার্কসীয় দর্শন পাঠ করে ভূয়োদর্শনের বড়াই করে থাকেন। অর্থাৎ আমাদের স্বধর্মে আস্থা নেই বলেই আজ আমরা—ঘরের সাহিত্য ফেলে বাইরের সাহিত্যের তারিফ করছি; তারিফ করবার মত বস্তু অবশ্যই সেখানে যথেষ্ট আছে, কিন্তু 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?' দেশের সাহিত্যকে আমরা যদি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে না পারি, তার উৎকর্ষ অপকর্ষ

যদি আমরা সহজভাবে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করে দিতে না পারি, তা হলে কোন অধিকারে আমরা সাহিত্যের সমালোচক হয়ে বসতে চাইব? তাই বলছিলাম—শশধরবাবুর সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে সাবধান বাণী—আমাদের সাহিত্য-আলোচনায় সাহায্যই করবে।

তিনি বলেছিলেন, আমাদের সাহিত্যে আমরা—"কেবল কি স্ত্রী মূর্ত্তির বিলাস-বিজড়িত রূপের বর্ণনাই করিব? যাহাতে কাম-প্রবৃত্তির এবং অসংযমের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কেবল কি তাহাই করিব? বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন মাসিক পত্রিকার ন্যায় কেবল কি ইন্দ্রিয় লালসার উত্তেজক স্ত্রী মূর্ত্তিই অঙ্কিত করিব? নাটক ও নভেলে নিরবচ্ছিন্ন প্রণয় ও প্রণয়েরই ছড়াছড়ি করিব? বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সদ্গুণ ও সদনুষ্ঠান সমাজের বিবিধ শ্রেণীর উপকারী হইতে পারে, তাহার চিত্র যথাযোগ্য ভাবে কাব্য-সাহিত্যে অঙ্কিত করিতে পারিলে সাহিত্যও সার্থক হয়, সেবাও সফল হয়। * * * নীচ যাহাতে উন্নত হয়, পতিত যাহাতে পবিত্র হয়, তেমন আদর্শ সৃষ্টি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্য হইতে কি চির-বিদায় গ্রহণ করিল? * * * কষ্ট করিয়া দশ পাতা যে পড়িতে পারে না, চিন্তা করিয়া দুইটি কথার মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হয় না, কালব্যাপিনী চেষ্টা শুনিলেই যাহাদের দেহে জ্বর আসে, সে ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র চুট্‌কী, চটুল, মজাদার শ্রবণেন্দ্রিয়ের আপাতসুখকর দুই দশ লাইন কবিতা, কি একটু ছোট গল্প ভিন্ন আর কি লিখিবে? কি বা পড়িবে? এখন ইহারই নাম সাহিত্য-সেবা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ * * সকলেই জানেন, আমরা নানারূপে একেবারেই মারা যাইতে বসিয়াছি। সাহিত্য-সেবা দ্বারা কি আমাদিগকে রক্ষা করা যায় না?"

সাহিত্য-সেবা দ্বারা আমরা আমাদের নিশ্চয়ই রক্ষা করতে পারি—কিন্তু আজ সাহিত্য সেবার পথে অনন্ত বাধা—তন্মধ্যে সাহিত্যিক হিসাবে আমরা নিজেরাই যে সে পথের সর্বাপেক্ষা ভীষণ বাধা। আমরা যে আজ আত্মপ্রতারণার আশ্রয়ে সাহিত্য-সেবক সাজতে চাই,—সাহিত্য-সেবা আমাদের উপলক্ষ মাত্র কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে আত্মনাম ঘোষণা। যে পথে আমরা চলছি—সেটা যে প্রকৃষ্ট পথ নয়—সে লক্ষ্য যে লক্ষ্য নয়, শুধু দিকভ্রান্তকারী আলেয়ার আলো—অতএব আমি যে পথ দেখাচ্ছি সেই পথই আসল

পথ, এমন কথা ব'লে কোনও সাহিত্য-সমালোচক যদি আমাদের পথ প্রদর্শন করেন—তাহলে সাহিত্যসেবার পথ উন্মুক্ত হয়। ভাবের ঘরে চুরি—পদে পদে ধরা পড়লেও—আমরা ব্যক্তিগত বিদূষণ প্রবৃত্তি থেকে নিরস্ত হতে জানি না। সাহিত্যের আলোচনা হোক উচ্চ স্তরের মনোবৃত্তি নিয়ে, সমালোচনা হোক ব্যক্তি-মানুষের হিংসা দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, হীনতা ও দীনতার বহু উর্ধ্বে তবেই আমরা সত্যকার পথে চ'লে সাহিত্যসেবা দ্বারা সঙ্কট থেকে রক্ষা পাব। কিন্তু সাহিত্য আলোচনা যদি আত্ম-প্রচারের পথ হয়, সাহিত্য সমালোচনা যদি সাহিত্যিক বিশেষের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা এবং তাঁকে পাঠক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার অস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয় তা হলে সেই সমালোচকগণকে—প্লেটোর কথায় বলতে হয় যে তাঁরা "always contradictory and refuting......like puppy dogs who delight to tear and pull at all who come near them."

অর্থাৎ অসঙ্গতিপূর্ণ পরস্পর-বিরোধী উক্তি দ্বারা তাঁরা সর্বদাই প্রতিপক্ষের সহিত তর্ক করেন—নিকটে এলে কুকুর শাবকের মতো সকলকে টানা হেঁচ্ড়া করে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে আনন্দ পান।

আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে সমসাময়িক সাহিত্যিক ও সমালোচকের মধ্যে শুধু যে সাহিত্যের আদর্শ ও রচনার উৎকর্ষ নিয়ে মতান্তর থাকে তাই নয়, লেখক বিশেষের প্রতি কোনও কোনও সমালোচকের অকারণ বিরুদ্ধ মনোভাব থাকায় এই মতান্তর অবশেষে মনান্তরে পরিণতি লাভ করে। এতে সাহিত্য সৃষ্টির পথে নিরুৎসাহ ও নৈরাশ্য আসে। এ সম্পর্কে হেনরি ফিল্ডিং, তাঁর "টম্ জোন্স" গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে সেই মন্তব্যটিই এখানে উদ্ধৃত করছি :—

"Now in reality, the world have paid too great a compliment to critics, and have imagined them men of much greater profundity than they really are. From this complacence, the critics have been emboldened to assume a dictatorial power, and have so far succeeded that they have now become the masters, and have the assurance

to give laws to those authors from whose predecessors they originally received them. The critic rightly considered, is no more than the clerk······the clerk became the legislator, and those very peremptorily gave laws whose business it was, at first only to transcribe them."

অর্থাৎ—বস্তুতঃ পৃথিবীতে সমালোচকেরা খুব বেশী মাত্রায় সাধুবাদ লাভ করেছেন—এবং জ্ঞানের যে গভীরতাটুকুর সত্যকার তাঁরা অধিকারী, তদপেক্ষা অনেক বেশী গভীরতা তাঁদের আছে বলে আমরা ধারণা করেছি। এই আত্মপ্রসাদের জন্য তাঁরা একনায়কত্বের দাবী করতে সাহসী হয়েছেন। তাঁদের সে দাবী আজ এতদূর পর্যন্ত সফল হয়েছে যে তাঁরা এখন প্রভু হয়ে বসেছেন এবং লেখকগণের পূর্বাচার্যদের কাছ থেকে তাঁরা আগেই যে বিধান পেয়েছিলেন তাই তাদের উপর চালাবার ভরসাও তাঁদের হয়েছে। ঠিক বিবেচনা করে দেখতে গেলে সমালোচকগণ কেরাণী ছাড়া আর কিছুই নন। কেরাণী বিধানদাতা হলেন এবং প্রথমে যাঁদের পেষা ছিল বিধানগুলি নকল করা তাঁরাই এখন সেগুলি লেখকগণের পক্ষে অবশ্য পালনীয় বলে জারি করে দিলেন।

যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন—তাঁর সে সৃষ্টির একটি নিজস্ব ধারা আছে—সেই বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে, তাঁর সংবেদনশীল মনের সঙ্গে, তাঁর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি সমালোচকের সংস্কার, বুদ্ধিবৃত্তি, আদর্শপ্রিয়তা এবং রচনার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করবার মানের কোনও প্রকার মিল না থাকে তা হলে সে সাহিত্যের সত্যকার সমালোচনা হতে পারে না;—পারে না বলেই আমাদের দেশের কোনও কোনও সমালোচক স্বয়ম্ভূ হয়ে আত্ম-অহঙ্কারে মশগুল থাকেন—লেখকের সঙ্গে কোনও দিকের কোনও বিষয়ে মিল না থাকাতে লেখক ও সমালোচকের মতান্তর ও মনান্তর সর্বজনবিদিত হয়ে পড়ে। সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে এর চাইতে অধিকতর শোচনীয় অবস্থা কি হতে পারে? বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে এমনই দু'একজন স্বয়ম্ভূ সমালোচকের আবির্ভাবে কমল বনে মত্ত হস্তীর বৃংহন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

তবে একথাও ঠিক যে সমালোচনা ছাড়া সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বুঝা

সম্ভব নয় এবং সমালোচনার অভাবে মুড়ি মিছরীর দাম এক হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচনা সর্বদাই সমালোচকের সহানুভূতি সাপেক্ষ ;—পক্ষপাতিত্ব নয়, সহৃদয় মনোভাবের সহিত বস্তু বিচারের চেষ্টা থাকলে সমালোচনা সার্থক হয় এবং তার দ্বারা সাহিত্যের কল্যাণ ও উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়ে থাকে।

লেখককে যেমন নিজের লেখার কঠোর সমালোচক নিজেকেই হতে হবে, তেমনি সমালোচকের উচিত হবে কিছুটা লেখকের চোখে দেখা, লেখকের মন নিয়ে চিন্তা করা। তফাতের মধ্যে হবে এইটুকু যে সমালোচক লেখকের পথে চলতে গিয়ে ভাবাবেগে অভিভূত হবেন না—নিজের সংস্কারজাত বিচার বুদ্ধির নির্দেশে কদাচ বিভ্রান্ত হবেন না।

আমাদের বক্তব্য এই যে লেখক ও সমালোচকের মধ্যে যোগাযোগকে সম্পূর্ণ কল্যাণপ্রদ করতে হলে পরস্পরের সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত—মনোভাবে, মতে ও বিশ্বাসে, রুচি প্রবৃত্তি এবং মতিগতিতে ; নিজের ব্যক্তিত্ব তৎকালের জন্য সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখে এ রকম হওয়া সম্ভবপর। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও তার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবার সংকল্প থাকলে—লেখকের সঙ্গে সমালোচকের বিরোধ হবার কোনও কারণই থাকতে পারে না। সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

একথা আমাদের অবিদিত নেই যে, রচনা যদি কষ্টকল্পিত, আয়াসলব্ধ ও অধ্যবসায়-প্রসূত না হয় তাহলে তার গতি হবে সাবলীল, তরতরিয়ে এগিয়ে চলবে – কোথাও হঠাৎ থেমে যাওয়া বা চলতে চলতে হোচট খাওয়ার চোট লাগবে না তার গায়ে। যিনি অভিজ্ঞ সমালোচক তিনি তা' সহজেই ধরতে পারেন—তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভুলও সহজে ধরা পড়ে। যাঁরা নবীন লেখক, তাঁদের পক্ষে কড়া সমালোচনা, সত্য এবং নিরপেক্ষ হলেও অনেক সময় নিরুৎসাহ ও দুঃখের কারণ হয়—কিন্তু তার অন্য উপায়ও নেই। যদি ভিতরে পদার্থ থাকে তাহলে ঘা খেতে খেতে রচনার আসল রূপটি লেখকেরই হাতে সুসংস্কৃত ও মরিমার্জিত হয়ে দেখা দেয়। তবে কঠোর সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে যদি সমালোচক বেদরদী হন তাহলে ফুল না ফুটতেই কুঁড়ি যে ধরণীতে ঝরে পড়বে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এখানে কবি কীট্স এর উদাহরণ দেওয়া

যেতে পারে—"Who killed Keats ?"

লেখক নিজে যদি নিজের লেখার কঠোর সমালোচক হতে পারেন—তাহলে তাঁকে আর সমালোচকের হাতে গঞ্জনা ভোগ করতে হয় না কিন্তু নিজের লেখার প্রতি অস্বাভাবিক মমতা থাকলে সংস্কার-পরাঙ্মুখ লেখকের পক্ষে সমালোচনা-সংকট থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও পথই থাকে না। তবে আমাদের সাহিত্যে গঠনমূলক সমালোচনা খুব বেশি দেখি না। হয় অতি-ভাষণ, নয় প্রীতি-ভাষণ, নয় কটু-ভাষণ—এতে করে লেখকের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ অনেক ক্ষেত্রেই একদেশদর্শিতার দোষে নির্ভুল পথে চলে না। পাশ্চাত্য মহিলা সাহিত্যিক Catherine Drinker Bowen বলেছেন—"A writer's friends are sometimes his worst enemies ; they confuse art with friendship and praise where they should query." অর্থাৎ সময় সময় লেখকের নিকৃষ্টতম শত্রু হয়ে পড়েন তাঁর বন্ধুবর্গ—তাঁরা আর্টের সঙ্গে বন্ধুত্বের গোলমাল করে ফেলেন। তবে এতে বন্ধুদের চেয়ে লেখকের দোষই বেশি বলতে হয় যদি লেখক সমালোচনার সাহায্য অপেক্ষা নিছক প্রশংসার দাবি করেন বন্ধুদের কাছে।

লেখক সমালোচনা চান কেন ? তাঁর রচনা উৎকৃষ্ট হয়েছে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য। অনেক লেখক সেটা নিজে থেকেই বুঝতে পারেন। তবে এরকম লেখকের সংখ্যা খুবই অল্প। নিজের লেখার সমালোচক নিজে হওয়ার উপদেশ বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বার দিয়েছেন।

সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য কিনা লেখকের পক্ষে এটাও বিবেচনা করে দেখা দরকার, কারণ সব সমালোচনাই যে সব দিক থেকে সকল সময় বিদ্যাবুদ্ধি বিচারশক্তি প্রসূত হবে এমন কোন কথা নেই। পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে, সমালোচক যা বলেছেন হুবহু সেই অনুসারে তাঁর রচনার পরিবর্তন পরিবর্ধন বা সংশোধন করে দিতে কোন লেখকই ইচ্ছা করেন না। কারণ কাটছাঁট নিশ্চয়ই ভাল কিন্তু দেখতে হবে ("pruning does not destroy the tree. Pruning makes tree grow stronger, the fruit tastier and bigger") তাতে গাছটা মারা না যায়, দেখতে হবে যে কাটছাঁট করে গাছটা আরও সবল হয়েছে, ফল হয়েছে আরও বড় আরও

সুস্বাদু। লেখকের পক্ষে আত্মপ্রত্যয় বড় জিনিষ—সমালোচনা সাহায্য করবে কিন্তু তার উপর সবখানি নির্ভর করে থাকলে সেটা আত্মনাশের সমান হবে। সমালোচকরা—"do not chart courses, solve literary problems and tell the author how to proceed" ; চার্ট করে কি ভাবে এগিয়ে যেতে হবে তা' বলেন না সাহিত্যিক সমস্যার সমাধানও করেন না ; বলেন— রচনাটি কেমন হয়েছে—এই পর্যন্ত—এবং ভাল বা মন্দ বলার সমর্থনে তিনি যুক্তি দেখিয়ে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

নিজের ভাবকে প্রকাশ করার তাগিদেই রচনার স্বষ্টি ; নির্জন নিঃসঙ্গ ভাবে লেখককে রচনা করতে হয়—বাসনা তার নিজস্ব,—পথের নির্দেশ আসে ভিতর থেকে, কাজেই অনপেক্ষ কবিমানসের বহিঃপ্রকাশ সমালোচকের কোনও ইঙ্গিতে ইশারায় বন্ধ হয়ে যাবার নয়।

যা' হোক "পাক্ষিক সমালোচক", 'বঙ্গদর্শন' "প্রচার" প্রভৃতির পরবর্তী কাল থেকে সাধারণতঃ আজ পর্যন্ত পত্র পত্রিকার সমালোচনা সেই ধারাকে অনুসরণ না করলেও তার মূলগত দৃষ্টিভঙ্গী নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রীতি পদ্ধতিতে এসে পৌঁচেছে। প্রচলিত বা অনুসৃত আদর্শের প্রভাব সমালোচনায় থাকা স্বাভাবিক কিন্তু সমালোচকের শিক্ষা দীক্ষা মনন-শীলতা তার উপর গভীর ভাবে রেখাপাত করে। পক্ষপাতিত্বের কথা ছেড়ে দিলেও সমালোচকের ভাল লাগা মন্দ লাগার সঙ্গে লেখক বিশেষের সম্বন্ধ থাকা অস্বাভাবিক নয়। ব্যক্তিগত বা দলগত মত যখন কোন একটি বিশেষ জীবন-দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত তখন সমালোচনাতে যে শুধু সাহিত্যিক মূল্যই যাচাই করা হয়েছে—এমন মনে করা যায় না। সংযত ভাষায় রচনার বিশ্লেষণ হওয়াও তখন সম্ভবপর হয় না। তাতে ফল এই দাঁড়ায় যে কেও প্রাপ্য থেকে বেশি পেয়ে যান আবার কেও বা একান্ত প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত হন। এমনও হয়েছে যে সাহিত্যে উপেক্ষিত অনেক লেখক নিম্নস্তরের রচনার জন্যও যথেষ্ট সাধুবাদ পেয়েছেন। প্রশংসার আতিশয্য যেমন সমালোচনার ক্ষেত্রে মারাত্মক দোষ তেমনি মারাত্মক সত্যকার গুণের প্রতি অমর্যাদা ও উপেক্ষার ভাব। রচনা উৎরালো কিনা তার বিচার যদি সমালোচকের মন্তব্যের উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারে—তা হলে অনুযোগের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বিচারের মান কঠোর হোক,—সত্য ভাষণে যদি অপ্রিয় কথাও শুনতে হয় তাতেও দুঃখ করার কিছু থাকে না—যদি বোঝা যায় যে সমালোচকের বিশ্লেষণী শক্তি অবিসম্বাদিত,—ব্যক্তি চরিত্রে তিনি নিঃসংশয়ে নিন্দার অতীত। তা হলে লেখক তাঁর রচনাকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করার সুযোগ পান। তবে যেখানে তার ব্যতিক্রম ঘটে—সেখানে বলা যেতে পারে যে সমালোচকের মতামতের উপর রচনার শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাগুণ বিচার নির্ভর করে না।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—তাঁর সতীর্থ ও বন্ধুমহলে একজন কবিতার পাকা সমঝদার ও সমালোচক বলে সমাদৃত ছিলেন। তিনি তাঁর কবিবন্ধু কালিদাস রায়কে রচনা সম্পর্কে যে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন—তার মধ্যে সমালোচক হিসাবে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর মননশীলতা ও কবিতার গুণাগুণ বিচার-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন—"পরের অনুকরণ দোষাবহ। নিজের অনুকরণ আরো দোষাবহ। এতে প্রতিভার দৈন্য সূচিত হয়। কোন একটা কবিতা উৎরে গিয়ে যশ অর্জন করল—অমনি সেই ধরণের সেই টেকনিকের সেই রসের আরো ৩।৪ টা কবিতা লিখে ফেললে—তা করো' না! একেই আমি বলি নিজের অনুকরণ। যেটা উৎরে গেছে তাকে স্বকীয় গৌরবে নিঃসঙ্গ থাকতে দাও।"

তাঁর অন্য একটি উপদেশের কথাও মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন—"কবিতার মধ্যেই কবিতার রসঘন চরণগুলির ব্যাখ্যা দিও না—তার টীকাভাষ্য কোরো না। তাতে কবিতা অযথা বড় হয় এবং জল্‌সে হয়ে যায়, রস তরল হয়ে যায়। পাঠকরা ঠিক বুঝতে পারবে না এই আশঙ্কা ক'রে ব্যাখ্যান দেওয়ার লোভ হয়। এ লোভ সংবরণ করাই ভালো। পাঠককে মিত্রভাবে দেখো, ছাত্রভাবে দেখো না"

—"কবিতা লেখার পরে তার মাজা ঘষা করার প্রয়োজন আছে। তবে প্রথমে দেখতে হবে অপকৃষ্ট চরণগুলোকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে কি না। যদি তা না চলে তাহলে সেগুলোকে মেজেঘষে শাণিত করতে হবে। অযথা অপকৃষ্ট চরণগুলোর জন্য পরিশ্রম না করাই ভালো।"

তিনি বর্তমান সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন যে আমরা সংস্কারমুক্ত মনে সাহিত্যের বিচার করি না—। সাহিত্যের যথার্থ বিচারে

আমাদের একটা বাধা ধর্ম। ধর্মের নামে আমরা অনেক অপকৃষ্ট সাহিত্যকে প্রথম শ্রেণীতে ঠাঁই দিই। আর একটা বাধা, স্বাজাত্য অভিমান ও দেশভক্তি। এই দুইয়ের নামে অনেক অপকৃষ্ট ও অশাশ্বত সাহিত্যকে নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করি। তত্ত্বটাকে বড় ক'রে আমরা অনেক সময় রসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করি। এ কথাগুলি সমালোচকদের ভেবে দেখা উচিত। "আমাদের দেশে তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিককে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক বানিয়ে বাড়াবাড়ি" করার তিনি বিশেষ নিন্দা করে বলেছেন—"এমনটি বোধহয় অন্য কোন দেশে হয় না।"

হয় কি না জানি না তবে আমাদের দেশে এক একটি পত্রিকাকে আশ্রয় করে যে দল গড়ে উঠ্‌ছে—তাদের দলভূক্ত কবি ছাড়া—বাংলাদেশে আর কোনো কবি নেই, তাদের গল্প ও উপন্যাসের লেখক, তাদের "আর্ট ক্রিটিক'ই যে আজকালকার সাহিত্যে একমাত্র জল-আচরণীয় আর সবাই বার্ত এমন প্রচার কার্যও সুকৌশলে চালান হচ্ছে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে—সাহিত্যের দলাদলি ক্রমশঃ পরাশ্রিত আলোকলতার লতাতন্তু জালে জড়িয়ে যাচ্ছে ; সে আলোকলতার আলোক নেই—যে রঙটুকু আছে তাও সে রঙের একমাত্র উৎস দীপ্ত রবির সহস্র শির্ষ থেকে ধার করে নেওয়া।

অন্যান্য দেশে বিশেষ করে বিলাত, ফ্রান্স, জারমানী প্রভৃতি দেশে শুধু সমালোচক হিসেবে বিশেষ নাম করেছেন এমন একাধিক ব্যক্তি সাহিত্যক্ষেত্রে আছেন—তাঁদের মন্তব্যের প্রতি লেখক ও পাঠকদের শ্রদ্ধা আছে,—বিশ্বাস ও সম্মানবোধ আছে। পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়ানর যোগ্যতা আছে অথচ সপ্রতিভ নন এমন জাত লেখকের ভাগ্যে খ্যাতিলাভ হয়ত সম্ভবই হোত না যদিনা এই সকল সমালোচকের হাতে পড়ে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য সাধারণ্যে প্রকাশ পেত। এ শ্রেণীর সমালোচকরা শুধু গ্রন্থ সমালোচনার জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি—সাহিত্যের পথে দিগদর্শীর কাজে তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার আলো লেখক সমাজকে সচকিত ও মোহিত করেছে—। এমন কয়েকজন সমালোচকের উক্তি উদ্ধরণ করে পূর্বেই আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছি।

বর্তমানে সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনার প্রধানতম বা একমাত্র আশ্রয়

সাময়িক পত্রিকা—। রাশি রাশি ভাল মন্দ বই সেখানে এসে জমা হয়—পত্রিকা-সম্পাদকদের মধ্যে সমালোচনার কাজ ভাগ করে দেওয়া আছে বিভাগীয় সম্পাদকদের মধ্যে। যে সকল গ্রন্থকে সাহিত্যক্ষেত্রে "Land mark" অর্থাৎ অসামান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও গুণসম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হয়—(যদিও তার সংখ্যাল্পতা পাঠকদের পক্ষে খুব উৎসাহের কথা নয়)—তাদের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য করতেও দেখা যায়—কিন্তু সে কদাচ কখনও। আমরা এমন ঘটনাও জানি যে প্রকাশিত গ্রন্থের দু'টি সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়—অথচ সে গ্রন্থ পড়ে আছে সমালোচনার অপেক্ষায় সম্পাদকীয় দপ্তরে। তা'ছাড়া সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রে স্থান সংকুলান হয় না—এ অজুহাতও শুনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার অনিবার্য প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্পর্কে আমরা আদৌ অবহিত নই। তবুও যে আমাদের দেশে পুস্তক ক্রেতা ও পাঠকের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে—তার জন্য প্রশংসা করতে হয় প্রকাশকদের—এবং সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসু পাঠক সম্প্রদায়কেও।

আমাদের পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে উপন্যাস এবং কিছুটা গল্পের বইও বটে—কিছুকাল থেকে অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। একথা সত্য হলেও বলা যায় যে প্রবন্ধের বইও আজকাল পাঠকসমাজে সমাদৃত হচ্ছে—আর সমাদৃত হচ্ছে বলেই—তার ক্রেতাও বেশ হয়েছে। মন্দ-ভাগ্য "কাব্য" এর অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই,—কবিতার পাঠক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রোত্তর কালের এবং বর্তমান কালের বহু কবির কাব্যগ্রন্থ আজ পাণ্ডু-লিপির আকারে উপেক্ষিত হয়ে আছে। কবিতা ছাড়া সাময়িক পত্রিকা চলে না—পাঠক কবিতা পড়তে চায়। বাংলা দেশে বাঙালীর মন কাব্যাশ্রয়ী—সেই মনকে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করতে কাব্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অবশ্য কয়েকটি খ্যাতনামা প্রকাশক—কবিতা-সংকলন প্রকাশিত ক'রে বাংলাদেশের কাব্যধারাকে তার ঐতিহ্যে সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করেছেন—আমরা বলব—তাঁরা এতে করে জাতির প্রতি তাঁদের অবশ্য কর্তব্য পালন করে প্রশংসার্হ হয়েছেন। কিন্তু আমাদের সমালোচনার ক্ষেত্র যদি অধিকতর প্রশস্ত হত এবং সত্যকার সমঝদার প্রকাশক ও সমালোচক সাহিত্যক্ষেত্রের এই

"Vacuum" বা শূন্যতা পূরণের সহায়তা করতেন এবং কাব্য-সমালোচনার ভার পড়ত কাব্যামোদী সমজদার সমালোচকদের উপর ; তদুপরি কর্তৃপক্ষেরও এবিষয়ে যত্ন ও উৎসাহ থাকত তাহলে কবিতা ও প্রবন্ধের বইএর আশানুরূপ প্রচার বৃদ্ধি পেত।

আমরা অনেক সময় বলে থাকি—আমাদের চিন্তাশীলতার ক্ষেত্র খুব সুপ্রশস্ত নয়, অন্ততঃ গভীর চিন্তা-শক্তির কাজে আমরা হাত দিতে চাই না—একথা সর্বাংশে নির্ভুল নয় ; কেন না গত পাঁচ দশ বছরের মধ্যে প্রবন্ধ পুস্তকে আমরা গবেষণা, অনুশীলন ও চিন্তাশীলতার যে পরিচয় পেয়েছি—তাতে মনে হয়—নদীর একূল যেমন ভাঙছে—ও কূল তেমনি গড়ে উঠছে—অর্থাৎ একদিকে যেমন চিন্তার লঘুতা, অনুশীলনের অক্ষমতা, সহজ ও সুলভ চিত্ত-বিনোদনের দিকে ঝোঁক ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে—যৌন আবেদনের আকর্ষণে যেমন চিত্ত-চাঞ্চল্যের লক্ষণ ক্ষেত্রবিশেষে অশোভন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে—তেমনি অন্য দিকে—কি রাষ্ট্র, কি সমাজ, কি সাহিত্য, কি শিল্পকলা সর্বস্তরেই একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে,—গভীর চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবেশ করছি—গুরুতর সমস্যার জটিলতা এড়িয়ে যাওয়া দূরের কথা আমরা নূতন দৃষ্টিতে পারিপার্শিককে দেখবার চেষ্টা করছি—বলিষ্ঠ মনোভাব জাগছে আমাদের কাব্যে, আমাদের সাহিত্যে ;—তার চিহ্ন নানাভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অর্থাৎ আমরা আমাদের স্থিতিভূমিতে আত্মশক্তির জোরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু সমালোচকের কাজ যদি সাময়িক ও সংক্ষিপ্ত হয়,—আসল লক্ষ্যের দিকে যদি তাঁর তর্জনীসঙ্কেত না থাকে—সাহিত্য রচনাকে, শিল্পকে তাদের মহৎ পরিচয়ে লোকচক্ষে তুলে ধরবার কর্তব্য যদি একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ে—তাহলে দেশের চিত্তক্ষেত্রে কৌতূহল, আকর্ষণ ও আগ্রহ জাগাবে কে ? সমালোচকতো বটেই—নিরপেক্ষ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তো নিশ্চয়ই।

আশ্চর্যের কথা এই যে আমাদের সাহিত্যিকদের অনেকেই আজ সাংবাদিক হয়ে বসেছেন, সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনাতেও অনেকে আছেন—তাঁরাও কি এটা চিন্তা করে দেখেন না বা অনুভব করেন না যে রচনা উৎকৃষ্ট হলেই হয় না…সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট, পরিচ্ছন্ন বাঁধাই, ভাল কাগজ, ভাল ছাপা

হলেই হয় না—কুশলী প্রকাশক হলেও হয় না—চাই সমালোচক—যাঁর লেখনীতে "পুস্তক-পরিচয়", "গ্রন্থসমালোচনা"র স্তম্ভটি এমন একটি বৈশিষ্ট্যে পাঠকমনকে আকর্ষণ করবে, যা' বিদগ্ধ সমাজকে আশান্বিত করবে, গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করবে সাহিত্য রচনার কাজে, অনুশীলন ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করার কাজে আমাদের নিত্য নূতন প্রেরণা দেবে। পাঠকেরাও দেখবেন নিত্য নূতন দিগন্তে বুদ্ধির আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে, অনুর্বর মাটিতেও নূতন রস-সঞ্চারে যে সোনার ফসল ফলছে—মনের হাটে তা' চড়া দরেই বিকিয়ে যাবে।

গ্রন্থাবলীর সামগ্রিক সমালোচনা এবং Critical আলোচনা হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, তৎপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে; এখনও সে আলোচনা চলছে, একাধিক বইও সে সম্পর্কে প্রকাশিত হবে। একখানি কাব্য-সমালোচনার বই পুরস্কৃতও হয়েছে কিন্তু সেই বইগুলি যাঁরা প্রচার করেছেন তাঁদের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁরা এতে সামগ্রিকভাবে সাহিত্যিক সমাজের প্রতি অবিচারই করেছেন—এবং দু'একখানি সমালোচনা গ্রন্থের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলা সাহিত্যকে আমরা যেরূপ সমৃদ্ধ বলে থাকি তার অজস্র উৎকৃষ্ট রচনার জন্য, তার শ্রেষ্ঠ লেখকের সংখ্যাধিক্যের জন্য সেটা সম্পূর্ণ ভুল কারণ উক্ত সমালোচকদের মতে বাংলা সাহিত্যের কবি মাত্র চার পাঁচজন, ঔপন্যাসিক জন পাঁচেক এবং প্রবন্ধকারের সংখ্যা হাতে গনা যায়। সর্বাপেক্ষা অবিচার করেছেন তাঁরা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রতি। তাঁদের একদেশদর্শী সমালোচনা ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়াতে বাংলাদেশের বিরাট কাব্য সাহিত্যকে তাঁরা বাজে কাগজের টুকরীতে বোঝাই করে ফেলে দিয়েছেন—অপ্রয়োজন ও অসার্থকতার ("unwanted") লেবেল এঁটে। এরূপ অপচেষ্টাকে আমরা শতাব্দীর অভিশাপ বলতে কুণ্ঠিত নই। এই সকল পুস্তকের অনুবাদ হলে—সংশ্লিষ্ট দেশের লোকেরা জেনে বিস্মিত হবেন যে কাব্য-প্রসিদ্ধিতে মাহিমান্বিত বাংলা সাহিত্যের কি চরম দুর্দশাই না আজ ঘটেছে। কানু ছাড়া গীত নেই জানতাম কিন্তু আমাদের দেশে আজ কয়েকজন কানুকে নিয়েই নামসংকীর্তন চলছে; এতে বাংলা কাব্যের একটি বিশিষ্ট অংশ এই স্বয়ম্ভু সমালোচকদের কাছে ধিক্‌ৃত হওয়ায় সারা বাংলাদেশের লজ্জাই তাতে প্রকটিত হয়েছে।

সাহিত্যে জীবনের মূল্যবোধ
মনুষ্যত্বের সাধনা

জীবনের মূল্যবোধকে আশ্রয় করে সাহিত্য গড়ে ওঠে—এ উক্তি শুধু সাহিত্য সমালোচকের নয়, এর প্রয়োগ-অর্থ সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু জীবনের মূল্যবোধ কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—এর মর্মার্থ এমনি ব্যাপক যে কোনও একটি সংজ্ঞা বা ব্যাখার দ্বারা তা সাধারণের কাছে বোধগম্য করা যায় না। শুধু অনুভূতি সাপেক্ষ, যুক্তিসহ বিচারের দ্বারা এই মূল্যবোধ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত যে না করা যায় তা নয়, তবে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত বলে সে সিদ্ধান্ত যে সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় সকলের কাছে স্বীকৃত হবে এমন আশা করাও সমীচীন হবে না। তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষের মান ঐ মূল্যবোধের দ্বারাই নিরাকৃত হয়ে থাকে।

সুখদুঃখ আশা আকাঙ্খায় জড়িত যে জীবন, যে জীবনের গতি-প্রকৃতির মধ্যে তার পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরাম নাই, চারিত্রিক মহত্ত্ব বা দীনতার মানে যে জীবনের বিচার হয়ে থাকে, সে জীবনের মূল্যবোধ স্বভাবতঃই নির্ভর করবে তার সামগ্রিক অভিব্যক্তির উপর। সংসার ও সমাজ এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে পৃথিবী থেকে সম্পর্কশূন্য কোনো জীবনের উপর আমরা কোনো মূল্য আরোপ করতে পারি না। কিন্তু সর্বদাই তার পটভূমির আয়তন ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকতে হয়। পারস্পরিক ঘটনা থেকে কোনো জীবন বিচ্যুত নয় এবং পরিবেশ ও কালপ্রভাব থেকে পৃথক করেও তাকে দেখা যায় না। মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, আশা ও নৈরাশ্য যখন সর্বদাই বস্তুনিরপেক্ষ এবং আপেক্ষিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তখন জীবনকে সর্বতোভাবে এমন দৃষ্টিভঙ্গী ও মননের দ্বারা বিচার করতে হবে যাতে তার প্রসারতা ও ঔদার্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ না থাকে।

কিন্তু বিচারকের দৃষ্টি যে সর্বদা নিরপেক্ষ হবে এমন আশা কি করা যায়? তাঁর মননশীলতা কি কোনো চতুষ্কোণ ছকে সীমাবদ্ধ থাকবে না এমন নিশ্চয়তা

আছে? তাঁর ব্যবহারিক জীবনের বহিঃপ্রকাশ কি সন্দেহাতীত? তা না হলে বিচার করবে কে?

যা'হোক আমাদের বক্তব্য এই যে, এ সকলের ব্যতিক্রমেও জীবনের মূল্য বিচার চলতে পারে—যদি আমরা নিঃসংশয় হতে পারি যে বিচার কার্যে মানুষটি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি ঊর্ধ্বে রেখে বিচার্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। এটা কি বিচারকের পক্ষে সম্ভব? আমরা বলব নিশ্চয়ই সম্ভব—কিন্তু আমাদের একমাত্র বিবেচনার বিষয় এই যে পরীক্ষক হিসাবে গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা মানুষটির আছে কি না। যদি থাকে তাহলেই হল। কাব্য বিচারের বেলায় যেমন শ্রেষ্ঠ কবি না হলেও চলে, কি গল্প, কি উপন্যাস—কি প্রবন্ধ—যে কোনো রচনার বিচার যেমন সূক্ষ্ম রসবোধ ও উচ্চাঙ্গের অনুভব শক্তি ও উপলব্ধি থাকলেই চলে, তেমনি জীবনকে তার পূর্বাপর বিকাশের পটভূমিতে বিচার করবার বেলায় উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত মনোভাব থাকলেই চলতে পারে।

সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে এই উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত মনোভাব অপরিহার্য। মানুষ ঘটনা সংঘাতের দাস, আশা প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ মন নানা পরিবর্তনের পথে পরিচালিত হয়। মস্তিষ্ক বুদ্ধি জোগায়, মন সংকল্প করে—দেহ কর্মশীলতার মধ্যে সাধ্যবস্তুকে করায়ত্ত করতে চায়। এই ক্রমিক পর্যায়ে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই গতি ও প্রকৃতির উপর জীবনের মূল্য আরোপিত হয়।—মূল্যবোধের প্রশ্ন এইখানেই ওঠে।

এই সহজ সত্য উপলব্ধি করবার দায়িত্ব সাহিত্যিকের, কেন না এই সত্য উপলব্ধির উপরই মনুষ্যজীবনের মূল্যবোধ নির্ভর করে। এই মূল্যবোধ-বিরহিত সাহিত্য যে সাহিত্যপদবাচ্য নয়—এই কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে কোন্ সাহিত্যিকের কতখানি উপলব্ধি হয়েছে অর্থাৎ তাঁর রচনায় সে বিষয়ে কি পরিমাণ পরিচয় আমরা লাভ করেছি তার তারতম্যের বিচার নির্ভর করবে কি প্রকাশিত পুস্তকের গুণাগুণ বিচারের শক্তি বা পাঠকের চাহিদার উপর? অর্থাৎ কোন পুস্তকের কত বৎসরের মধ্যে কতটি সংস্করণ হয়েছে তার উপর? পুস্তক মূল্যের উচ্চতা সত্ত্বেও তার বহুল প্রচারের উপর? সমালোচকদের বিচারের উপর? আমাদের মনে হয় এ

সকল তথ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং তার সামগ্রিক বিচারের উপরই সাহিত্য রচনার এতৎবিষয়ের সার্থকতা নির্ভর করবে। কিন্তু এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রচার-শিল্প অধুনা এমনি কুশলতা লাভ করেছে যে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বিচার ক'রে পুস্তক নির্বাচনে ক্রেতারা অধিকাংশ স্থলেই অসুবিধা বোধ করে থাকেন।

তবে এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রচারধর্মী বিক্রয়-কৌশল সব সময়ে সফল হয় না। সত্যকার উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বিচার হয় রসজ্ঞ পাঠক সাধারণের কাছে, আবার পাঠক সাধারণের কাছ থেকে তার প্রচার হয় ক্রেতাগণের মধ্যে। দায়িত্বশীল সমালোচকের মন্তব্য অবশ্যই পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফল কখনো অশুভ বা অসার্থক হয় না।

আসল কথা সাহিত্যিকগণ যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে মনুষ্য জীবনের মূল্যবোধ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন তা হলে ক্রেতা বা পাঠকসাধারণ অহেতুক ও অবাঞ্ছনীয় বঞ্চনা থেকে রক্ষা পান।

'বড়' হওয়ার সাধনা

সাহিত্যিকই হোন আর বৈজ্ঞানীকই হোন, চারুশিল্পীই হোন আর দার্শনিকই হোন, 'বড়' মানুষ হয়ে ওঠাই মনুষ্যত্বের সাধনা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির অধীত বিদ্যায় মানুষের পারঙ্গমতাই বিচারের একমাত্র মান নয়; এই সকল বিষয়ে প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের পক্ষে মাত্র সেই বিষয়ের অধিগম্যতাও বিবেচনার সবটুকু স্থান অধিকার করতে পারে না। খ্যাতিমান কবি, প্রাবন্ধিক বা কথা-সাহিত্যিক—যতই বিখ্যাত হোন না কেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন বৈজ্ঞানিকের দান যতই প্রচুর ও মূল্যবান হোক না কেন—মানুষ হিসাবে তাঁরা কত বড় তার বিচারেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে অমরত্বের নিরীক্ষা হয়ে থাকে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বিচারের ওই একই ধারা যুগে যুগে মনুষ্য সমাজে চলে এসেছে। আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে লুম্বিনী নামক উদ্যানে যে রাজপুত্রের জন্ম হয়—উত্তরকালে তাঁর ঐশ্বর্য ও রাজশক্তির জন্য তাঁর প্রসিদ্ধি দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েনি—হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতি ও

মানুষের শোক, দুঃখ, দৈন্য, বেদনা ও অসহায় অবস্থার উপলব্ধিই তাঁকে মানুষের কাছে প্রিয়ঙ্কর ও শুভঙ্কর করে আজও পর্যন্ত দেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। কত যুগ চলে গিয়েছে তবু মানুষ আজও তাঁকে সর্বলোকের আশ্রয় ও প্রেমের অবতার ব'লে তাঁর মন্ত্র জপ করে চলেছে। শুধু নির্বাণ লাভের জন্য নয়—তিনি যে তাঁর অন্তরের অনির্বাণ আলোকে মানুষকে একান্ত আপনার বলে দর্শন করেছিলেন, আত্মার আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই জন্যই তিনি মানুষের কাছে প্রিয় হতেও প্রিয়তর হয়ে, "বড়" বলে আরাধ্যতম হয়ে আছেন।

তেমনি ধরা যাক সাহিত্যের কথা। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিমোহিনী প্রতিভা ও অশ্রুতপূর্ব সৃজনী শক্তির কথা আজ সারা পৃথিবীতে সর্বজন সুবিদিত। মহাকবি কালিদাস থেকে বৈষ্ণবপদকর্তা চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি, আবার প্রাচীন কবিকুলের সাধনা-সার্থক যুগের পরবর্তী কালের সর্বাধিক সম্ভাবনা-ঋদ্ধ নবযুগের প্রথম ও প্রধান কবি রবীন্দ্রনাথের কথা আজ বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে স্মরণ করতে হয়। স্মরণ করতে হয়—তাঁর সাহিত্যকীর্তির গগনস্পর্শী অপ্রমেয়তার কথা। প্রাচুর্যে যেমন কল্পনাতীত, উৎকর্ষে তেমনি ধারণাতীত তাঁর সাহিত্য-কর্মের যুগকে আমরা বলি রবীন্দ্র যুগ—রূপের বিন্যাস-বৈচিত্র্যে সুন্দর, রসের অবিমিশ্র মধুর আস্বাদে তৃপ্তিকর—সুললিত শব্দের ঝঙ্কারে শ্রুতি-মধুর, সুমধুর গন্ধের আবেশময়তায় উপভোগ্য, বিচিত্র স্পর্শের উন্মাদনায় অপূর্ব, অতুলনীয় রবীন্দ্র কাব্যের স্রষ্টার মধ্যে যে বিরাট মানুষটি তাঁর স্বস্থানে অনন্যসাধারণ মহিমায় মহিমান্বিত—মানুষ হিসাবে তাঁর সমগ্র প্রভাব মানুষের অন্তরলোকে পরিব্যাপ্ত। কাব্যে বড় রবীন্দ্রনাথকে মনুষ্যত্বে বড় মানুষটি থেকে পৃথক করে দেখলে আসল বিচারে অক্ষমতার ত্রুটি থেকে যাবে। সমগ্র প্রকৃতির ভাবরূপ ও রসরূপের উপাসক রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্র মানুষের ব্যক্তি-সত্তা ও জাতি-সত্তার প্রতীক, মানবিকতার পূজারী একথা ভুললে চলবে না। ভাবতন্ময় কবিমানসের অন্তঃস্থলে প্রেমবিহ্বল করুণাস্নিগ্ধ মানুষটির আসল রূপটিকে উপলব্ধি করতে হবে—কীর্তিকে ছাড়িয়ে যে মানুষ ঊর্ধ্বে উঠেছে কিন্তু মানুষের চিরন্তন স্থিতি-ভূমি এই মাটির পৃথিবীতে সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, আবেগ উদ্বেগ আশা আকাঙ্ক্ষা—আনন্দ নিরানন্দ ব্যর্থতা ও সাফল্যের

সঙ্গে বিজড়িত মানুষকে ভুলে যান নি বা অবাঞ্ছিত তুচ্ছ উপেক্ষার বস্তু বলে' দূরে ঠেলে ফেলেননি, সে মানুষটি বড় কবি হলেও—বড় মানুষ—যে মানুষের জীবন-বোধের ব্যাপ্তি আজ সর্ব মানুষের চিত্তভূমে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বলেছেন—তিনি "ক্রান্তদর্শী ও তত্ত্বদর্শী"—তিনি "কবি-সম্রাট, জনগণের আশ্রয়ণীয়।", তিনি "কবিসত্তম"। তিনি বলেছেন—"রবীন্দ্রসাহিত্যের সব চেয়ে বড় এবং শেষ কথা কি? সে হল মানুষ, যে মানুষ পৃথিবীতে সীমার মধ্য হতে অসীমের স্পর্শ পেয়েছে, যে মানুষ পৃথিবীতে থেকেও দ্যুলোকের জ্যোতি থেকে বঞ্চিত নয়। মানুষের মলিনতা ও ক্ষুদ্রতার ক্রমশ স্খালন হয়ে তার শ্রেষ্ঠ মহিমায় পূর্ণ বিকাশ, এই হল তাঁর চরম আকাঙ্খা, এই অত্যুঙ্গ মানব মহিমার জয়গানই তাঁর শ্রেষ্ঠ সুর। কাব্যে, সাহিতে, উপন্যাসে, সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায়, রাষ্ট্রনৈতিক ভাষণে—সর্বত্র তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সকল সমস্যার বিচার করেছেন, এই সুরই তাঁর সর্বত্র অনুরণিত।" তাই বলি, রবীন্দ্রনাথ মানব মহিমার জয়গান গেয়েছেন বলেই তিনি বড় মানুষ।

কলকোলাহল মুখরিত সংসারে—এই বড় মানুষের জীবন মনুষ্যত্বের সাধনায় সার্থক এবং তাঁর বিশুদ্ধ আত্মা ও প্রসন্ন চিত্তের সংস্পর্শে আসলে যে সম্পদ লাভ হয়—তার মূল্য অবধারণের যে মূলসূত্র আমরা প্রায়ই তা' হারিয়ে ফেলি বলে' আমরা মানুষ থেকে মনুষ্যত্বকে আলাদা করে দেখি।

আমরা দেখেছি, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও আবিষ্কারে একক ও অনন্যসুলভ প্রতিভার অধিকারী বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে; তিনি বিজ্ঞান জগতে চিরস্মরণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র—সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—এবং অসাধারণত্বে আপন সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে তিনি নিজেকে মানুষের পরিচিত পথ থেকে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীর কল্যাণে যাঁর দান অসাধারণ তিনি স্বভাবগত কুণ্ঠায় সাধারণ মানুষকে দূরে রেখে চলেন। মানুষকে তিনি পৃথক করে দেখেন, মানুষও তাঁকে প্রকৃতির নিয়মে পৃথক ভেবেই চলে। এখানে মানুষ হিসাবে তাঁর সম্পূর্ণতা স্বীকৃত হতে পারে না। অথচ সমগোত্রীয় কোনো বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা ও দানের অতুলনীয় প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষের মধ্যে মানুষ হিসাবে বিচরণ

করেন—দ্বিধা নেই, কুণ্ঠা নেই, অহঙ্কার নেই—আত্মভোলা হয়েও তিনি মানুষকে ভোলেন না—তার সান্নিধ্য কামনা করেন—যেমন কামনা করেন তার কল্যাণকেও। এই ব্যক্তির দর্শন লাভ সৌভাগ্যের বিষয়—এই ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ সীমাবদ্ধ নয়—প্রসন্ন অন্তরে তিনি মানুষকে গ্রহণ করেন—আবার ধ্যাননিমগ্ন মুহূর্তে হয়ত সেই মানুষকেই কাছে টানতে ভুলে যান—নমস্কারের প্রতি নমস্কার করতে অথবা কুশলপ্রশ্নের উত্তরে কুশল প্রশ্ন করবার প্রয়োজনও হয়ত অনুভব করেন না। অথচ তাঁর শিশুসুলভ সদাহাস্যময় মুখের দিকে তাকালে মনেও হয় না তিনি এড়িয়ে গেলেন বা উপেক্ষা করলেন। প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ সেই বৈজ্ঞানিকের মন—সে মন মানুষের কাছে ধরা দেয়, মানুষও তাঁর কাছে একাত্মবোধের আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই বৈজ্ঞানিক মানুষ হিসাবে বড়—তাঁর বড়ত্ব সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত; অন্তরের প্রসন্নতায় এবং মানুষের প্রতি স্বভাবসুলভ দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতিতে সেই মানুষটি আমাদের কাছে বড় বলে সম্মানিত হয়ে থাকেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে লোকচিত্তজয়ী নেতা সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে। দেশবন্ধু আগে মানুষ হিসাবে বড়—পরে তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে দেশের শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতির অধিকারী। সুভাষচন্দ্রের জীবনেও পূর্বাপর আমরা এই গুণের উৎকর্ষ দেখেছি এবং তিনি চিত্তজয়ী বড় মানুষ না হলে শুধু সমর-কৌশল আয়ত্তে এনে পূর্ব এশিয়ায় নানা বর্ণ, নানা শ্রেণী ও নানা জাতির বিভিন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন না! গান্ধীজির জীবনই বাণী—যদি একথার আসল তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের বক্তব্য বিষয় আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিম্ন স্তরের মানুষ,—অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ নরনারী, অবজ্ঞাত উপেক্ষিত সমাজের প্রতিটি মানুষকে তিনি আত্মার আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই আজ গান্ধীনামের মহিমা সাধারণ মানুষের সমাজে অলৌকিকত্ব লাভ করেছে। কাল তা ধ্বংস করতে পারে না—সমাজ বা রাষ্ট্রবিপ্লব তাকে বিনষ্ট করতে পারে না—কালে কালে তার মাহাত্ম্য ও সার্থকতা মানুষের চরিত্রে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে—এটা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। গান্ধীজি একজন বড় মানুষ ছিলেন বলেই তিনি বিশ্ববাসীর কাছে আজ নমস্য হয়ে আছেন।

বড় মানুষ হওয়াই মনুষ্যত্বের সাধনা—এই সাধনার বীজ মানুষের জীবনে উপ্ত থাকে তার জন্ম-কালে। গৃহসংসার ও সমাজের পরিবেশ, অবস্থার তারতম্য ও ঘটনাচক্রের দ্রুত আবর্তনের মধ্যে মানুষ বেড়ে চলে। তার অঙ্কুরের বিকাশ অবশ্য নির্ভর করে অনুকূল অবস্থার উপর কিন্তু একথাও ঠিক যে অবস্থাধীন হয়েও মানুষ সাধনার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি অর্জন করতে পারে। সেজন্য সাহিত্যক্ষেত্রে সাধনার কথা প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে ; সহজাত বৃত্তি ও প্রবৃত্তির দোহাই দেওয়া সকল ক্ষেত্রে চলে না।

সাহিত্যকর্ম মানুষের সাধনা—কিন্তু মনুষ্যত্বের সাধনা বাদ দিয়ে নয়। মানুষটিকে বাদ দিয়ে কাব্য বিচার করতে গেলে শুধু অলঙ্কার শাস্ত্র, আঙ্গিক, ব্যাকরণ ও রসসৃষ্টি প্রভৃতির নির্দিষ্ট মানের সাহায্যে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হব—তার মধ্যে অনেক ত্রুটি থেকে যাবে ; কারণ কবি-মানসের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয় মানুষের নিত্য দিনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা আনন্দ ও নিরানন্দের সংস্পর্শে এসে,—আঘাতে সংঘাতেই তার মনুষ্যত্বের বিকাশ—তা সে কাব্য সাহিত্যেই হোক আর সংসার জীবনেই হোক। এখানে সত্যকার অনুভব শক্তি বা উপলব্ধির তারতম্যের কথা আসে। যে বেদনার গান কবি অশ্রুজলে নিবেদন করেন, সে বেদনা তো মানুষেরই, তবে কি বেদনা অনুভবের মধ্যে কোথাও ফাঁকি আছে যার জন্য কবিকে আমরা সত্যকারের মানুষ হিসাবে দেখতে পাব না ? যদি সে গানে মানুষেরই অন্তরের কথা থাকে তা হলে কবিকে আমরা মানুষের পর্যায়ে ফেলেও বিচার করতে পারি। মানুষ কবি, কবিই মানুষ, এই ধারণাতে তাঁর নিকট সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বিড়ম্বিত বা উপেক্ষিত হবে না, মানুষে মানুষে একাত্মবোধ কবির প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদার দাবিকে আরো বলবৎ করবে—বড় মানুষ হিসাবে কবি মানুষের প্রীতি ও সমাদর লাভে শ্লাঘা অনুভব করবেন।—আর তাঁর বড়ত্বই তাঁকে বৃহৎ ও মহৎ সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সাহিত্যে সদাচার

সেজন্য সাহিত্যকর্মের গোড়ার কথা দাঁড়ায় সদাচার—; এই সদাচার মনুষ্যত্বের সাধনার পথকে প্রশস্ত করে। নীতিমূলক অনুশাসনের কথা না

হয় নাইবা ধরলাম কিন্তু আর্টের দোহাই দিয়ে আদর্শ বা নীতি-বাক্যকে উড়িয়ে দেব এমন মনোভাবের মধ্যে আধুনিকতার মোহ থাকতে পারে—কিন্তু যদি আধুনিকতার তাৎপর্য বিচার করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে হৃদয়কে নির্বাসন দিয়ে শুধু বস্তুতন্ত্রের ভাব-বিলাস উগ্র হয়ে উঠছে—যদি দেখা যায় যে ললিতকলার অন্তরঙ্গ রসকে বাদ দিয়ে বহিরঙ্গের প্রসাধন ও অঙ্গ সৌষ্ঠবসাধনের অতিকৃতি প্রবল হয়ে উঠছে, তা হলে বুঝতে হবে মূল বস্তু থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি। সাহিত্যে মিথ্যাচার না করা, আত্মপ্রতারণা না করা, উপলব্ধি শক্তির অপব্যবহার না করা, আত্মস্বার্থে আদর্শের পবিত্রতা নষ্ট না করা, সহধর্মী সাহিত্যিকের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত না হওয়া, বিদূষণে প্রবৃত্ত না হওয়াই সাহিত্যে সদাচারী হওয়া। বর্তমান সাহিত্যিক সমাজে এই সদাচারের প্রতি সদম্ভ উপেক্ষা কোনও কোনও ক্ষেত্রে যেন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। গোষ্ঠির গৌরবে ব্যক্তি যদি গৌরব বোধ না করে, সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টির কল্যাণ এই সনাতন সত্যের প্রতি যদি আমরা ভ্রূক্ষেপ না করি, তা হলে বলতে হয় যে আমরা সাহিত্যে সদাচার রক্ষার প্রয়োজন অনুভব করছি না।

সদাচারী সাহিত্যিক মানুষ হিসাবে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ; তাঁর অন্তরলোকে যে ধ্যানের প্রদীপ জ্বলছে—তার আলোক অন্যের নিকট থেকে ধার করা নয়। দ্বেষ হিংসা নেই, পরশ্রীকাতরতা নেই, অন্যের পতন অভ্যুদয়ে হৃদয় সমভাবে প্রভাবিত এমন সাহিত্যিক সদাচারের গুণে বড় মানুষ হতে পারেন এবং বড় মানুষ হয়ে তিনি কবিখ্যাতির সঙ্গে মানুষের হৃদয়-রাজ্যে প্রীতির আসন অনায়াসেই অধিকার করতে পারেন।

সদাচারে যদি সমাজের শুদ্ধি ঘটে, লোকচক্ষে সমাজ-জীবনের আদর্শ ও আচার-আচরণ অনুকরণীয় বলে গ্রাহ্য হয়, তা হলে সাহিত্যিক সমাজে বা সাহিত্যক জীবনে সদাচারের প্রয়োজন ও সার্থকতা যথেষ্ট আছে বলেই মনে করা যেতে পারে—কারণ সাহিত্য শুধু সমাজের ছবি নয়, তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও দুর্বলতা, তার সমস্যা ও সুখদুঃখের প্রতিচ্ছবি এবং প্রতিধ্বনিও বটে। সাহিত্য রচনায় সমাজ থেকেই উপাদান সংগৃহীত হয় এবং নরনারীর চরিত্র চিত্রনে মানুষের সত্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে সাহিত্যিক শিল্পীর কাজ করে

থাকেন—সাহিত্য যেমন নরনারীর সুখ দুঃখ আনন্দ, আশা আকাঙ্খা, নৈরাশ্য ও বেদনা উপযুক্ত ভাষা ও বিন্যাস কুশলতায় প্রকাশ করে তেমনই ভবিষ্যৎ দিনের উজ্জ্বল আলোকে নূতন মানুষের নূতন মর্মকথাকেও মুখর করে তোলে। সাহিত্যিকের দায়িত্ব গুরুতর বলেই সদাচার তার চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হওয়া উচিত।

বড় সাহিত্যিক যদি বড় মানুষ হ'ন—অর্থাৎ তিনি যদি ছোট বড় ভেদাভেদ ভুলে মানবিকতার পবিত্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সদাচার-পরায়ণ হতে পারেন তা হলে তাঁর সে দৃষ্টান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসৃত হবে। উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত অন্তরে স্বর্গের মহিমা আপনা হতেই বিকশিত হয়—মালিন্য তিরোহিত হয়ে আলোকোজ্জ্বল দিবসের প্রতিশ্রুতিতে হৃদয় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে—আজ সেই উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত হৃদয়কে আহ্বান জানাই—আমাদের সাহিত্যিক সমাজে। সাধারণের চক্ষে করুণার পাত্র, অনুগ্রহের ভিখারী সাহিত্যিক জীবন কোনো-দিনই কারও কাম্য ছিল না—আজও নয়। সত্যকে, শ্রেয়কে, প্রেয়কে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করবার কাজই বড় মানুষের কাজ—বড় সাহিত্যিকের কাজ। তাই বলি, মনুষ্যত্বহীন সাহিত্যসাধনা—ভক্তিহীন পূজা অর্চনার মতো—সেখানে আড়ম্বরের অন্ত নেই, বাদ্যোদ্যমের উতরোলে নাটমণ্ডপ মুখরিত —জলুষ আছে কিন্তু পৌরুষ নেই, আছে শূন্য অহঙ্কারের আতসবাজি।

সাহিত্যে দেহবাদ

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—"সাহিত্যে দেহবাদ" সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্য কি ? সে প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি—প্রথমতঃ এটা সাহিত্য বিচারের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। দেহ-সর্বস্ব বস্তুতান্ত্রিকতার দোহাই দিয়ে এযাবৎ কাল সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে ; প্রত্যক্ষ ভাবে যা দৃষ্টিকটু, মর্মপীড়াদায়ক রুচিবিগর্হিত, তাকেও 'আর্ট' বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমাদের মধ্যে বিরল নয়—অথচ 'আর্ট' বা শিল্পাচার এমন একটি কলা-কৌশল যার বিকাশে কাব্য বা সাহিত্যের রচনা-বিষয় সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে' রসিক চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করে। পক্ষান্তরে সাহিত্য বিচারে সুরুচি ও কুরুচির গোঁড়ামিতে আমরা দেহবাদ বা দেহাত্মিক রচনাকে এমন একটি নিকৃষ্ট স্থানে নামিয়ে দিয়েছি যে তা'তে করে জীবনের একটি দিকের এক চিরন্তন সত্য উপেক্ষিত হয়েছে। মার্জিত রুচির নামে, শ্লীলতা অশ্লীলতার অজুহাতে, শাস্ত্র ও সমাজনীতির দোহাই পেড়ে আমরা প্রকৃত শিল্পসুষমামণ্ডিত এই শ্রেণীর রচনাকে অপাঙক্তেয় করে দিয়েছি। মানুষের শাশ্বত সত্তাকে অস্বীকার করে, সত্য, শিব ও সুন্দরকে অবহেলা করে, আর্টের নামে প্রবৃত্তিকে তার সমস্ত আবরণ সরিয়ে চোখের সামনে যাঁরা তুলে ধরেন, মানুষের চিরন্তন প্রেমাভিলাষকে বিকৃত করে যাঁরা একমাত্র দেহসম্ভোগের লালসাকেই বড় করে দেখিয়ে বলেন—মানুষের জীবনে এইটাই আসল সত্য—আমরা যেমন তাঁদের দলে নই তেমনি যাঁরা প্রবৃত্তির নিবৃত্তিকেই একমাত্র চারিত্রিক শক্তি ব'লে মনে করে সাহিত্যে দেহবাদকে একবারে নস্যাৎ করে দিতে চান—সে সকল নীতিবাগীশদের দলেও আমরা নই। সাহিত্য বা কাব্যের বহিরঙ্গটাই বড় নয়—তার অন্তরঙ্গের কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে—কোনও রচনার প্রকৃত বিচার হতে পারে না—সেজন্য আমরা স্বভাবতঃই রচনার গুণবিচারে ভুল করি এবং লেখকের প্রতিও অবিচার করে বসি। আসল অর্থ অপেক্ষা কদর্থ করা খুব সহজ—এবং লাগসই কথায় নিন্দা করলে পাঠকের কাছ থেকে

বাহোবা পাওয়া হয়ত সহজ হয় কিন্তু তাতে করে সাহিত্যের অনেক দুর্লভ সম্পদকে আমরা তথাকথিত রুচির দোহাই দিয়ে অস্পৃশ্য করে রাখি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ওমর খৈয়মের কাব্য সম্পর্কে কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে এমনি একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে—যাতে অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে মদ্যপ ও পরনারী-আসক্ত ব'লে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে—কিন্তু ওমর শুধু যে একজন মহাকবি ছিলেন তাই নয়—তিনি ছিলেন একজন উচ্চস্তরের দার্শনিক—এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জগৎ সংসারকে দেখতে গিয়ে তিনি নিরাশ হলেও—পরিশেষে ঈশ্বরকেই যে অনুধ্যানের একমাত্র বস্তু বলে মেনে নিয়েছিলেন—এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয়।

ওমর খৈয়াম বলছেন :

Here with a loaf of bread beneath the bough
A flask of wine, a book of verse—and thou
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise now.

বৃক্ষশাখার তলে এক টুকরো রুটী, সুরাপাত্র, একখানি কাব্যগ্রন্থ ; আর তুমি এই বিজনে আমার পাশে বসে গান গাইছ। এ বিজনভূমি এখন স্বর্গ।

এই "তুমি", "সুরা" ও "সাকি" নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে খোরাসানের নাইসাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন কবি ওমর খৈয়াম; দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অর্থাৎ একশতাব্দী পরে তাঁর মৃত্যু ঘটলেও তাঁকে লোকে ভুলে যায়নি ; বস্তুতঃ তাঁর প্রতিভা, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির উচ্চ শিখরে তাঁকে তুলে ধরেছিল তাঁর অগণিত পাঠক পাঠিকা। তাঁর গুণগ্রাহীর দল এখনো জাতিধর্মনির্বিশেষে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। Eat drink and be merry অর্থাৎ খাও দাও পানকর এবং আনন্দে বগল বাজাও—এ কথাটার একটা বিশিষ্ট আকর্ষণ আছে, তবু তাঁর কবিতার গভীর অর্থ উপলব্ধি করবার চেষ্টা যে চলেনি তা নয়।

জীবন সম্পর্কে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এযাবৎ বহু বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে—নিজের মনের মতো করে তার ব্যাখ্যা করেছেন অনেকে। বিবিধ ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের অনুগামী উগ্রপন্থীরা তাঁদের নিজের নিজের দলে ওমরকে ভিড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। কারো কারো মতে তিনি ছিলেন

একজন উচ্চধরনের মরমী (Mystic) কবি, কেওবা তাঁকে পরম ধার্মিক বলে অভিহিত করেছেন ; আবার এমন লোকেরও অভাব নেই যিনি মনে করেছেন নারী ও সুরার প্রতি আসক্ত ওমরের কোনো ধর্ম্মই ছিল না, জীবন-দর্শনের ধারে কাছেও তাঁর যাতায়াত ছিল না, মূলতঃ তিনি ছিলেন একজন পহেলা নম্বরের ইন্দ্রিয়পরায়ণ মগুপ।

কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যকার কবি—খাঁটি, সরল ও স্বাভাবিক। নানা সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে যা' তিনি দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কবিমানস তারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যসৃষ্টির সহায়তা করেছে। তাঁর চিন্তাধারা কোনো ধরা-বাঁধা পথে চলেনি,—উদার দৃষ্টি, প্রশস্ত ও সহৃদয় অন্তঃকরণ তাঁর কাব্যে প্রতিভাত হয়েছে ; সেখানে নারী ও পুরুষের চিরন্তন প্রেম-সম্ভোগের কামনাকেই শুধু একমাত্র বিচার্য বস্তু বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। আমরা উন্মুক্ত মনে যদি রুবাইয়েতের উপর ভিত্তি করে এই কবি-মানুষটিকে এবং তাঁর জীবন-দর্শনকে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে—অনেক ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমরা অব্যাহতি পাব। তাছাড়া ওমরের জীবন-উপভোগের আর একটি দিকের কথাও ভুললে চলবে না।

ওমর খৈয়ামের অনুবাদক এডোয়ার্ড ফিটজিরাল্ড বলেছেন :

Having failed of finding any Providence but Destiny, and any world but this, he set about making the most of it ; preferring rather to soothe the soul through the senses into Acquiesence with Things as he saw them, than to perplex it with vain disquietitude after what they might be.

তিনি সৌভাগ্যের দেখা পেলেন না, পেলেন শুধু নিয়তির। অপর কোনও জগতের সন্ধান মিললনা, মিলল শুধু এই জগতের। সুতরাং তিনি তারই পূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করলেন। ভাবলেন, যা হতে পারে তাই নিয়ে মিছে অশান্তি ভোগ করে কি হবে—তার চেয়ে যেমন দেখছি ইন্দ্রিয় গ্রামের সাহায্যে তাই স্বীকার করে নিয়ে আত্মাকে শান্ত করাই ভাল।

জগতের অনিত্যতা এবং তার অপস্রিয়মান গৌরবের জন্য নৈরাশ্যবোধ, এর ফলে ইহকালের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ, দুঃখসন্তাপহারী সুরার প্রতি আসক্তি, জাগতিক আচার আচরণের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা প্রভৃতি

ওমরকে একদা নৈরাশ্যবাদী করে তুলেছিল কিন্তু তাঁর জীবন-মরুতে 'ওয়েসিস' ছিল বলেই তাঁর জীবনদর্শনের দিকটা তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এমন হৃদয়গ্রাহী হতে পেরেছে। সেই জন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে আমার সমাধি এমন জায়গায় হবে যেখানে উত্তর বায়ু অনায়াসে সেই সমাধির উপর অজস্র গোলাপ ছড়িয়ে দিয়ে যেতে পারবে। (My tomb shall be in a spot where the north wind may scatter roses over it.)

ওমর বলেছেন—মানুষের যা কিছু আগ্রহ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা তা' শুধু বর্তমানের জন্যই থাকা উচিত—অতীতের জন্য অনুশোচনা করা নিরর্থক, অতীত কখনো ফিরে আসে না; ভবিষ্যৎ অদৃষ্টপূর্ব—কি ঘটবে তা' আগে থেকে কেও বলতে পারে না।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এরূপ মনোভাবকে ভ্রান্তবুদ্ধি-প্রসূত বলে ব্যঙ্গ করতে পারেন কিন্তু ওমর খৈয়াম বলেন—মানুষের জীবনে দুর্ঘটনাই চরম পরিবর্তন এনে দেয়। সময়ের আয়ু অতি অল্প, তাই তিনি জীবনকে সর্বভাবে উপভোগ করতে চান:

Ah! Fill the cup what boots it to respect
How time is slipping underneath our feet:
Unborn TOMORROW and dead YESTERDAY
Why fret about them if TO-DAY is sweet!
One moment in Annihilation's waste,
One movement of the well of life to taste—
The stars are setting and the caravan
Starts for the Dawn of nothing—oh! Make haste!

আহা পাত্র ভরে নাও; পায়ের তলা দিয়ে যে সময় চলে যাচ্ছে। আগামী কালের জন্ম হয়নি এবং গতকাল মৃত—এদের নিয়ে ছটফট করে লাভ নেই যদি আজকের দিনটি মধুর হয়। এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে তো একটি মুহূর্ত, জীবন-উৎসে সুধাপানের জন্য একটি বারই হাত বাড়াতে পারা যায়। নক্ষত্রগুলি অস্তমিত হয়ে আসছে; নিরর্থক উষার দিকে সার্থবহ এগিয়ে চলেছে, ত্বরান্বিত হও।

এর সঙ্গে বোহেমিয়ার কবি Herrickএর লেখা কবিতার চারটি লাইনের বক্তব্য বিষয়ের সাদৃশ্য আছে:

Gather ye rose-buds while ye may
Old time is still a-flying,

And this same flower that smiles to day
To-morrow will be dying.

যখন পার কুড়িয়ে নিও গোলাপফুলের কুঁড়ি
পুরান দিন যায় রে চলে যায়,
যে ফুলটি আজ হাস্‌ছে দেখ,
কালকে সে ফুল শুকিয়ে ঝরে যায়।

ওমর খৈয়ামের কবিতায় বাহ্যত চটুল ভাবাবেশ ও সম্ভোগ-আসক্তির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলেও তার অন্তরদেশে মানুষ ও দার্শনিক কবির চিত্ত-স্থৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অসংলগ্নতা নেই, অতি অসাধারণ বিশ্লেষণেও হঠকারিতা দেখানর অভ্যাস নেই ;—তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করেন, আপন মনে যুক্তি তর্ক করেন—তার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হন—এটা তাঁর কাছে ধর্মনীতি পালনের সামিল। তাঁর অনুরাগীরা তাঁর এই নীতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন—ওমরের কাব্য তাই তাঁদের কাছে ধর্মগ্রন্থের মতই পবিত্র। খৈয়াম বলছেন :

Myself when young did eagerly frequent
Doctor and Saint, and heard great argument,
About it and about : but evermore
Came out by the same door as in I went.

তরুণ বয়সে অনেক চিকিৎসক ও সাধুর কাছে গিয়েছি, অনেক তর্কবিতর্ক শুনেছি। কিন্তু প্রত্যেক বারই যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছি ঠিক সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

দার্শনিক ওমর সত্য ও পরম বস্তুর সন্ধানে নিঃসন্দেহে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সংসারে দেবতার মত যাঁরা শ্রদ্ধা পান সেই ধর্মধ্বজ সাধু ও দার্শনিক পণ্ডিতের কাছ থেকে তাঁকে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসতে হল অসন্তুষ্ট চিত্তে।

তিনি এবার মুখ ফিরালেন স্বর্গের দিকে :

Then to the rolling heaven itself I cried,
Asking, what lamp has Destiny to guide
Her little children stumbling in the Dark
And—"A blind understanding" ; Heaven replied.

আমরা নিতান্ত শিশু অন্ধকার পথে বাধা পাই
শুধালেম দ্যুলোকেরে, কি বর্ত্তিকা আছে তাঁর হাতে
পথ দেখাবার লাগি ? মহাকাশে শুনিলাম বাণী—
"নিষ্প্রশ্ন বিশ্বাস শুধু"—নাহি আর অন্য কোন কথা।

অর্থাৎ ঊর্ধ্বে আকাশের পানে চেয়ে আর্তকণ্ঠে ওমর জিজ্ঞাসা করলেন —"তোমার অজ্ঞান সন্তানেরা অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে, তাদের দিক-দেখানর জন্য বিধাতার কোন্ দীপবর্তিকা আছে? উত্তর পেলেন—অন্ধ নিঃসংশয় বিশ্বাস।

ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার এবং অন্ধ অনুসরণের যুক্তিতে কখনই তার বিচার চলে না। দৈব চেয়েছিলেন অকুণ্ঠ বিশ্বাসে, নির্ভরশীল উৎসুক মনকে তুষ্ট করতে কিন্তু এ রকম অকুণ্ঠ বিশ্বাস মানুষের মনোবৃত্তির ঠিক বিপরীত। ওমর খৈয়াম ঈশ্বর, বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরলেন, কিন্তু যখন ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসছেন, তখন কে যেন তাঁর কানে কানে বলে দিল—'মানুষের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ এবং মানুষ জীবহিসাবেও অতি ক্ষুদ্র—তাই তার পক্ষে অন্তহীন ঈশ্বর ও অসীম বিশ্বপ্রকৃতিকে জানা সম্ভবপর নয়; তা'ছাড়া ঈশ্বরই পরম জ্ঞানস্বরূপ ও সর্বোত্তম বুদ্ধির আধার। ওমর হৃদয়ঙ্গম করলেন মানববুদ্ধির ক্ষুদ্রতা ও ব্যর্থতা এবং তিনি অভিমান ভরে যুক্তিকে পরিহাস করে চললেন আপনার হৃদয়াবেগে। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় পৃথিবীকে উপভোগ না করলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। কবির এ উপলব্ধিকে দেহবাদের অজুহাতে সমালোচক উপেক্ষা করেছেন।

জীবনের পানপাত্রে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি উপভোগ করতে চেয়েছিলেন ওমর খৈয়াম। স্বল্প আয়ু, বহু বিঘ্ন, অতএব ভবিষ্যতের আশা নয়, অতীতের অনুশোচনা নয়—বর্তমানকে একান্ত করে জীবনকে চরিতার্থ করা। নিট্জের সেই "To-morrow is uncertain, to day is yours." অথবা টেনিসনের "Drink life to the lees" অথবা কবি Ernest Dowson এর—

> Life is a little while and love is long ;
> A time to sow and reap,
> And after harvest a long time to sleep.

> অনন্ত অশেষ প্রেম, এ জীবন ক্ষণকালস্থায়ী
> এইত সময় বীজ বপনের ফসল কাটার
> ঘরে তুলে সে ফসল দীর্ঘ নিদ্রা দিও অতঃপর।

অথবা জার্মান কবি Heinrich Heine এর আট লাইনে সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ কবিতাটি যেমন সুন্দর তেমনি অর্থবহ :—

Lay thou thy cheek against my cheek
So there be but one flood of our weeping!
Upon my heart press close thy heart,
So together their flames may be leaping.

গালের উপর তুমি গালখানি রাখো—
দুজনের অশ্রুধারা এক হয়ে যাক,
হৃদয়ে হৃদয় রাখো নিবিড় আশ্লেষে
একত্রে তাদের অগ্নি-শিখা যেন জ্বলে।

প্রতিপক্ষের সমালোচক বলবেন—এ সবই ভোগায়তনের কথা—শুধু সুললিত বাক্যবিন্যাসে সুখপাঠ্য কিন্তু এর ভিতরে দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান করতে গেলে ঠকতে হবে। কথাটা ঠিক তা নয়—তৃষিত চিত্তের আনন্দ অবিমিশ্র নয়—দেহাতীত আনন্দ-উপলব্ধির ক্ষেত্র মাটির পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে, সেটা রক্তমাংসের শরীরধারী মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র নয়—। ওমর খৈয়াম বা ঐ পথের কবিরা তাই মাটির পৃথিবীতে পা রেখে কথা বলেন বটে কিন্তু দৃষ্টি তাঁদের প্রসারিত থাকে আকাশের দিকে। সুরা সাকী প্রভৃতি তাঁদের সে দৃষ্টিতে খুবই গৌন।

সেজন্য দেহবাদ ও দেহতত্ত্ব এককথা নয়, আমাদের দেশে আউল বাউল মহাজন সম্প্রদায় দেহতত্ত্বের গান অনেক শুনিয়েছেন—বহু উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা যায়—কিন্তু আজ আমরা সে আলোচনা থেকে বিরত থাকব।

কাব্যে, গল্প উপন্যাসে, রম্যরচনা প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয় ভোগসুখের আধার দেহের প্রশস্তি সর্বদেশে সর্বকালেই দেখতে পাওয়া যায় এবং সেখানে দেহবাদ ও দেহতত্ত্বের কথা কোথাও সুস্পষ্ট কোথাও বা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। রতিসুখবাসনায় রম্যান্তিক প্রকাশ-ভঙ্গিকে আমরা প্রশংসা করি আবার তার অতি উৎকট অভিব্যক্তি বা বিচার-বিবেচনাশূন্য কুৎসিত অতিকৃতিকে নিন্দা করে থাকি। আর্টের ধর্ম প্রকাশ এই যুক্তিতে দেহবাদের জয়গান এক শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে লোভনীয় হতে পারে কিন্তু সে ভিন্ন কথা। সুষ্ঠু প্রকাশনে আর্টের ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় না—অসুন্দরকে, কদর্যকে আর্ট ক্ষমা করে

না—; রুচিবিগর্হিত উত্তেজক বাক্য-বিন্যাসে সহজদাহ্য প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া যায় কিন্তু তাতে সাহিত্যের উৎকর্ষ ঘটে না। দেহ বাদ দিয়ে দেহবাদের কথা সাহিত্যে চলবে এমন অসঙ্গত প্রত্যাশাও আমাদের নেই—তবে যেখানে দেহসর্বস্ব ভোগবিলাসের স্থান সকলের উপরে দেওয়া হয়েছে দেখি সেখানে কাম ও কামনার অতি সহজ ও স্থূলভ আবেদনকে আমরা আর্টের পর্যায়ে ফেলে আত্মপ্রতারণা করতে চাই না। ওমরের পক্ষ সমর্থনে আমাদের বলবার কথা তাই।

বিষয়বস্তু বর্ণনায় যেমন রুচিবোধের পরিচয় থাকা দরকার, ভাবপ্রকাশে ব্যবহৃত ভাষাতেও তেমনি প্রকাশ পাওয়া দরকার লেখকের ভদ্র মন ও শিষ্টাচারসম্মত লোকব্যবহারের। উৎকট কামগন্ধী রচনাকেও ভাষার মারপ্যাঁচে পাঠ্য করে তোলা যায়। কিন্তু যেহেতু মানুষের আদিম প্রবৃত্তির কথা বলছি অতএব তারই উপযুক্ত চমকপ্রদ ভাষা ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কেউ কেউ বলে থাকেন—"স্তনাগ্রচূড়া" না বলে "যুগল স্বর্গ" বললে বিষয়বস্তুটি খুব পরিষ্কার করে বলা হয় না অর্থাৎ ভাবখানা এই যে, বস্তুর অস্তিত্ব যখন রুচিসাপেক্ষ নয় এবং যা' সত্য তা' ইঙ্গিত-নিরপেক্ষ তখন সাহস যদি থাকে তাহলে প্রকাশ করে বলাই ভাল। কিন্তু "ওগো অসম্বৃতা"র স্থলে "ওগো উলঙ্গিনী" যদি এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে বাহোবা পায় তাহলে সাহিত্যে নব্য আর্টের যে আমদানি হবে তাতে সাহিত্যধর্মের বিসর্জন না হোক অন্ততঃ সজ্ঞানে যে গঙ্গাতীরস্থ করা হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। ওমর খৈয়ামের ভাষার লালিত্য ও শালীনতা যে সর্বত্র সমভাবে রক্ষিত হয়েছে—আমাদের মোদ্দা কথা এখানে তাই। কোনো এক সুপরিচিত পুস্তকপ্রকাশকের সুমুদ্রিত পুস্তকতালিকায় প্রকাশিত "পুরস্কার প্রাপ্ত উত্তর" এর নমুনা দিই ঃ

> "আমি সেই সুন্দরীকে দেখে লই—
> নুয়ে আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নেই—রূপ ঝরে পড়ে তার—

এই কবি সম্পর্কে বিজ্ঞাপনের মধ্যে জনৈক (নব্য ?) অধ্যাপকের অভিমত প্রকাশিত হয়েছে ঃ

"যুগের গ্লানি থেকে আলোকের প্রেম থেকে অপ্রেমের মহাজিজ্ঞাসায় উত্তরণের ব্যাকুলতা তাঁর কাব্যে, যা' তাঁর আজীবনের সাধনায় গড়া একটি সুস্থির দার্শনিক বিশ্বাস থেকে এসেছে।"

– "সুস্থির দার্শনিক বিশ্বাস" এর এ নিদর্শন সত্যই উপভোগ্য। কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছে এই যে অধ্যাপকেরা তরুণ ছাত্রদের নিয়েই অধ্যাপনা করেন।

এই পুস্তিকায় আর একজন কবির প্রশংসাপত্র সহ কবিতার পঙক্তি বিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে :

কাল সকালে যখন সূর্য উঠ্‌বে
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা:"

এখানে শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন নয়—এখানে এই কবির মনোবৃত্তি ও কল্পনাশক্তির শোচনীয় দুর্গতি দেখে "morbidity—a step preceding insanity" এই কথাটি মনে পড়ে। রুচির কথা বাদ দিলাম— কাব্যের যদি প্রকৃতি থাকে তাহলে এটা সেই প্রকৃতিরই ব্যভিচার। এই কবি নাকি "লুপ্ত রোমাণ্টিকতার" "হাহাকারে নূতন রোমাণ্টিকতার সৃষ্টি করছেন।" —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম চরণ থেকে আরম্ভ করে ওমর খৈয়ামের শেষ কবিতার শেষ চরণ পর্যন্ত কোথাও ভাষার অস্পষ্টতা ও ভাবের অসংলগ্নতা বা দুষ্ট-প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় না। সাহিত্যরচনার প্রথম ও প্রধান বিবেচনার বিষয় ভাষার প্রয়োগ অপপ্রয়োগের কথা! মানুষের চরিত্রের ছায়া পড়ে তার ব্যবহৃত ভাষায়। রচনার গুণাগুণ বিচারে তাই ভাষা-বিচারের স্থান অপ্রধান নয়।

একমাত্র দেহবাদকে প্রাধান্য দিয়ে কাব্য রচনা হয় না বা গল্প উপন্যাস লেখা চলে না এমন কথা বলি না কিন্তু বলি রবীন্দ্রনাথের কথায়—"হল কিনা, সেইটেই বড় কথা" অর্থাৎ রচনা সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হল কিনা সেইটেই বিচার্য। এই হওয়ারও একটা রীতি আছে এবং সে রীতি যথাযথ পালনের দিকে দৃষ্টি থাকা উচিত, কেন না বিপরীত বুদ্ধির ফলে অনাচার ঘটবার আশঙ্কা থেকে যায়। ওমর খৈয়ামের কাব্যে দেহাত্মিক উপলব্ধি আছে— মানুষের পরম ক্ষুধা নিবৃত্তির উদগ্র আহ্বান আছে—আগ্রহ আছে, কিন্তু কোথাও

তার বিকৃত প্রকাশ বা অশোভন মনোভাব প্রদর্শনের চেষ্টা নেই। নেই বলেই তাঁর কাব্য রসিকজনের কাছে সমাদর লাভ করেছে এবং তার মধ্যে বস্তু আছে বলেই আজো পর্যন্ত তার আলোচনা চলছে বিদ্বজ্জনসমাজে। সে কাব্যে সুরার জয়গান আছে, সাকির প্রশস্তি আছে, সীমিত জীবন ও স্বল্পকাল-স্থায়ী যৌবনের আকুল আবেদন আছে। রম্যতায় যেমন হৃদ্য, শোভনতা ও শালীনতায় তেমনি মার্জিত তাঁর কাব্যে দেহবাদের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ও সম্ভোগসুখের সুগভীর আবেগ থাকা সত্ত্বেও এমন একটি রসঘন পর্যায়ে মনকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় যেখানে অন্তরঙ্গে পাঠক ও কবির মিলন ঘটে—সে মিলন কালজয়ী। দেহাত্মিক হয়েও তাই ওমর কাব্য আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উঠে গেছে।

এই প্রসঙ্গে ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক Alberts Moraviaর কথা মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন একটি তরুণী বারবনিতার জীবন কাহিনী ; সেই মেয়েটির আত্মস্মৃতি এই কাহিনী বা উপন্যাসের উপজীব্য ; স্থান মুসোলিনীর রোম ; বস্তিতে মানুষ এই মেয়েটি, মা সেলাইয়ের কাজ করে' সংসার চালায় —অভাবে অনটনে বিপর্যস্ত অশান্তিময় সংসার। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনি নরম সরম তার স্বভাব ; কিন্তু সে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ; প্রথম প্রেমের অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র সম্ভোগ-বাসনার বশীভূত হয়ে এই তরুণীর জীবনে অবস্থাবিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গিয়েছিল ; অশন বসনের অভাব, নিত্যদিনের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য, ক্ষুধার তীব্র জ্বালার সঙ্গে যৌবনের অতৃপ্ত তৃষ্ণা,—সদ্য লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান কামনার কাছে আত্মবলিদান—এই নিয়েই উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে। আগুনের দিকে ঠেলে দিলে তাকে তার বয়োধর্ম, তার যৌবনসুলভ আসক্তি ; সেই আগুনে সে জ্বলতে লাগল—ভাগ্য তাকে ধাপে ধাপে নামিয়ে নিয়ে গেল একাধিক সহস্র রজনীর অন্ধকার পাতাল পুরীতে ; যন্ত্রণা ছিল—নিঃসহায়তার অবসাদ ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড মুহূর্তের আনন্দও যে সে পায়নি তাও নয়। তবু তার জীবনের দুঃখ ও দুর্গতি, আনন্দ ও বিষাদের মধ্যে তার ক্রম-পরিবর্তিত অবস্থার যে অগ্নিময় আলোড়ন—এই উপন্যাসে মেয়েটির নিজের মুখেই সে কাহিনী নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন লেখক, কিন্তু তা' এই চরিত্রের মেয়েদের বা বস্তি

বাসিনীদের গ্রাম্যতাদুষ্ট ভাষায় নয়, লেখকের মার্জিত রুচিপ্রসূত কাব্যময় সুললিত সাহিত্যিক ভাষায়। লেখক তাই তাঁর মুখবন্ধে বলেছেন—

"I could either adopt a realistic, photographic, spoken style of language, typical of a woman of Adriana's class and profession, a clumsy, poor dialect, incapable of expressing more than a limited number of feelings and incidents, or I could make my characters speak in my customary style. ***I chose the second course for two reasons : firstly, I did not see any necessity to change my style because I had changed my characters, and secondly, the language of literature is always truer and more poetically expressive than the spoken language."

অর্থাৎ তিনি বাস্তবানুগ 'হুবহু' কথ্য ভাষাও ব্যবহার করতে পারতেন, যে ভাষা আদ্রিয়ানার সমশ্রেণী ও সমব্যবসায়ী মেয়েরা ব্যবহার করে থাকে। সে এক কদর্য ঐশ্বর্যবিহীন ভাষা, যা দিয়ে অতি সামান্য সংখ্যক ভাব বা ঘটনা বর্ণনা করা যায়। অথবা তিনি তাঁর সচরাচর ব্যবহৃত ভাষাতেই তাঁর পাত্রপাত্রীকে কথা বলাতে পারতেন। তিনি দু'টি কারণে শেষের পথ বেছে নিয়েছেন। পাত্রপাত্রী বদলিয়েছেন বলেই যে ভাষাও বদলাতে হবে এমন কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ কথ্য ভাষা অপেক্ষা সাহিত্যের ভাষা সব সময়ই অধিকতর সত্য, তার কাব্যসুলভ প্রকাশ ক্ষমতাও অনেক বেশী।

এই ভাগ্যহীনা মেয়েটির জীবনের প্রতি লেখক সহানুভূতি সম্পন্ন—তার নিজের মুখ দিয়েই লেখক তার এই পতিত জীবনের জন্য কৈফিয়ৎ দিয়ে দিয়েছেন—"আমার ইন্দ্রিয় সুখের কাছে আমার অন্তরের অনিচ্ছা পরাভূত হয়েছিল"—

"The pleasure of my senses overcame the reluctance in my heart."

বহু-বল্লভা এই রমণীর নৈশ জীবনের অন্ধকার পটভূমি লেখকের সমবেদনায় সময় সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেই ভোগাসক্ত জীবনের স্বীকৃতির মধ্যে এই মেয়েটির আন্তরিকতার যে কারুণ্য ফুটে উঠেছে সেটা সত্যই হৃদয়স্পর্শী এবং হৃদয়স্পর্শী হয়েছে শুধু ভাব বা সমবেদনার দিক থেকে নয়, সুনির্বাচিত ও

মার্জিত ভাষা ব্যবহারের কৃতিত্বে ; মেয়েটির মুখের কথা শুনতে শুনতে মনে হয় যেন গল্প শুনে যাচ্ছি—রুচিজ্ঞানে কোথাও আঘাত লাগে না। অথচ নারী-পুরুষের অবৈধ মিলন-সম্ভোগের কথাই সেখানে বলা হয়েছে। মেয়েটি বলছে :

"As a mutter of fact, something very like a crime had been committed that day, by all of us—by Riccardo through stupidity, by Giasella through envy, by Astarita through lust, and by me through inexeperience."

বস্তুতঃ সেদিন আমরা যা করলাম সেটা প্রায় অপরাধের সামিল। সেটা রিকার্ডো করল তার নির্বুদ্ধিতার জন্য, গিয়াসেলা করল হিংসায়, অস্টারিটা করল ভোগ লালসায় আর আমি করলাম অনভিজ্ঞতার জন্য।

"I thought how I had come out of endless night and soon go on into another endless night and that my brief passing was marked only by absurd and casual actions. I then understood that my distress was caused not by what I was doing but more profoundly by the bare fact of being alive, which was neither good nor evil but only painful and meaningless."

আমি ভাবলাম কেমন করে আমি এক অন্তহীন রাত্রি থেকে বেরিয়ে এসে আর এক অন্তহীন রাত্রে প্রবেশ করলাম, আর সেই সংক্ষিপ্ত সময়যাপন শুধু অদ্ভুত ও সাময়িক কাজের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে রইল। আমি তখন বুঝলাম আমার এই দুর্গতির কারণ কি। আমি যে কাজ করছিলাম সেটা তার কারণ নয় ; আমি যে সজ্ঞানে সে কাজ করেছি শুধু সেইটেই হচ্ছে তার নিগূঢ় কারণ। সে কাজ করা ভালও নয় মন্দও নয়, তা কেবল যন্ত্রনাপ্রদ এবং অর্থহীন।

"I seemed no better off than before, despite the sacrifice of my honour."

মর্যাদা বিসর্জন দিয়েও আড্রিয়ানার মনে হল না যে সে পূর্বাপেক্ষা সচ্ছন্দে আছে।

"I like tidiness and cleanliness very much indeed because they seem to indicate corresponding mental qualities. But Son zogno's tidiness and cleanliness aroused a very different sensations in me that evening, something between horror and fear. That was the way surgeons got ready in a hospital** when they had to perform some bloody operation or worse, slaughterers under the very eyes of the lamb they are about to kill. By lying there on the bed I felt as helpess and powerless as a lifeless body about to undergo an experiment."

আমি সত্যই ছিমছাম্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পছন্দ করি কারণ তার দ্বারা মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 'সন্জগনো'র ছিমছাম্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সেদিন সন্ধ্যায় আমার মনে অন্য ভাবের উদয় হোল, বিভীষিকা ও আতঙ্কের মাঝামাঝি। সেই রকম ছিমছাম্ পরিষ্কার ভাবেই হাসপাতালের সার্জন খুব বড় অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন। তার চাইতেও আরো খারাপ দৃশ্য—যখন কসাই যে মেষশাবকটিকে হত্যা করবে তারই সামনে ছুরি শানাতে থাকে। এই ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে আমার মনে হতে লাগল, আমার দেহে প্রাণ নেই, আমার কোনও শক্তি নেই, আমি নিরুপায়, আমার সেই দেহের উপর যেন একটা পরীক্ষা হতে চলেছে।

যে স্বৈরিণী নারী লোকচক্ষে হেয়, তার অন্তরে প্রকৃত নারীসত্তা অবিরাম বিদ্রোহ করে চলেছে—প্রতি দিন প্রতি রাত্রের অসহ্য পরিবেশের সঙ্গে; অথচ অভ্যাসের দাস মনুষ্য স্বভাবের অনতিক্রম্য রীতিতে ক্ষণিক আনন্দের স্পর্শও লাগছে তার বিক্রীত আত্মসমর্পিত দেহে ও মনে—এ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় থেকে তার মুক্তির উপায় নেই, পালাবার পথ নেই, আত্মগোপন করে থাকার মত আশ্রয়ও নেই—; এই 'ট্র্যাজিক' জীবনের সত্যমূল্য যাচাই করে দেখার মত সহানুভূতি ও দরদ লেখকের আছে বলেই তিনি এই নারীর পঙ্কিল নৈশ জীবনের আনুপূর্বিক বর্ণনা করে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তার আসল রূপটি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন—তাতে পাঠকেরও মনে জাগে এই দুর্গত জীবনের প্রতি স্বাভাবিক সমবেদনা। লেখকের সে চেষ্টা সফল হয়েছে কারণ তিনি ব্যবহার করেছেন সেই ভাষা যে ভাষা সাহিত্যের নিজস্ব ভাষা, যে ভাষা নায়ক নায়িকার শ্রেণীসুলভ সাধারণ কথ্য ভাষা নয়—তদপেক্ষা শ্রুতিমধুর মার্জিত ভাষা যা' কাব্যধর্মী প্রকাশ-কুশলতায় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি Symone এর "Stela Maris" নামক সুবিখ্যাত কবিতা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে আমাদের বক্তব্য বিষয় আরো পরিস্ফুট করে দেখাচ্ছি—

> "The chance romances of the streets,
> The Juliet of a night ? I know
> Your heart holds many a Romeo."
>
> পথের আকস্মিক ভালবাসা
> এক রাত্রির জুলিয়েট ?

জানি, আমি জানি
তোমার হৃদয়ে আছে অনেক রোমিও !

"I too have sought on many a breast
The ecstasy of love's unrest
I too have had my dreams, and met
(Ah Me !) how many a juliet.
You come to call me, come to claim
My share of your delecious shame."

আমিও খুঁজেছি অনেক কোমল বক্ষ
অশান্ত প্রেমে আকুল উত্তেজনা !
আমিও অনেক দেখেছি স্বপ্ন, পেয়েছি—
কত জুলিয়েট হয়েছে আপন জনা।
তুমি এসে ডাকো মোর কাছে চাও
তব কলঙ্ক-সুধা পানে মোর অংশ তোমায় দিতে।

"Ah no oblivion, for I feel
Your lips deliriously steal
Along my neck, and fasten there ;
I feel the perfume of your hair
I feel your breast that heaves and dips
Desiring my desirous lips,
And that ineffable delight
When souls turn bodies, and unite
In the intolerable, the whole
Rapture of the embodied soul."

বিস্মৃতি নেই অনুভব করি আমি—
তোমার মধুর অধর স্পর্শ নিথর হয়েছে এসে
গণ্ডে আমার, মধুর আবেশে স্থায়ী হয়ে অবশেষে ;
তোমার কেশের সৌরভ অনুভবি,—
অনুভবি তব বক্ষের ওঠা নামা
তোমার তপ্ত অধর আমার তৃষিত অধর তরে।
না-বলা সুখের গহনে হৃদয় দু'টি
দেহে দেহে যবে মিশে যায় এক হয়ে
সেই সে মিলনে অসহ্য সুখাবেগে
দেহী আত্মার সে হর্ষ অনুভবি।

বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনা সৌকর্যে প্রত্যেক কথাটি এখানে ইঙ্গিতপূর্ণ। এই বিষয়টিই বিংশ শতাব্দীর একাধিক বৈদেশিক কবির এবং অধুনাতন বহু ইংরেজ

ও ফরাসি কবির কবিতাতে যে সত্যকার সার্থক রচনায় রূপ নিয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিদেব গানে যে মিলন বিরহ, সম্ভোগ ও রতিসুখবাসনার বর্ণনা আছে তার নির্গলিত অর্থ বিশ্লেষণ করে অনেক সমালোচক অনেক শক্ত কথা বলেছেন কিন্তু অন্তরঙ্গ রসের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রবেশ নেই বলেই বহিরঙ্গ নিয়ে তাঁরা এমন নাসিকা কুঞ্চন করতে সাহসী হয়েছেন। কিন্তু সে কথা থাক।

যে কাব্যের আবেদন সর্বকালে সর্বস্থানে প্রসারিত, সে কাব্যের পটভূমি বস্তুসর্বস্ব দেহধর্মী নরনারী হলেও সে কাব্য কামনার পীঠস্থান নয়—তার গভীরে আছে সুন্দরের আহ্বান, তৃষিত আত্মার বেদনাময় মর্মবাণী। পদ লালিত্যে ও সুর-সঙ্গতিতে ওমরের কাব্য চিরন্তনের জন্য মধুর রসের সৃষ্টি করেছে—সে রস আনন্দরস বলেই উপভোগ্য, কারণ রচনাশৈলীতে সে কাব্য রসোত্তীর্ণ—দেহবাদের আপাতঃ আকর্ষণ সেখানে গৌন বলেই কোথাও বিন্দুমাত্র রসাভাস ঘটেনি।

দেহাত্মিকা মতি বা আত্মরতির পরিমাপে কাব্য বা সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা ভুল করি,—বলি,—এতে কামগন্ধ আছে—এতে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা আছে—অতএব এটা শৃঙ্গার রসের কাব্য বা দেহবাদী সাহিত্য। এ সিদ্ধান্ত যে শুধু অযৌক্তিক তাই নয়—সমালোচনার মৌল নীতির উপরও এ প্রতিষ্ঠিত নয়। তাছাড়া শৃঙ্গার রসের কাব্য তো সংস্কৃত সাহিত্যে কালজয়ী হয়েছে।

তরিকুল আলম বলেছেন "ওমরের কবিতার মধ্যে অনেক সমালোচক সুরা ও কামের গন্ধ পাইয়াছেন, রূপসীর পাৎলা ঠোঁটের জিয়ান-রসের স্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম যেমন 'ব্রহ্ম মিথ্যা' কখনও বলেন নাই, তেমনি শুধু নাচ, গান, পান কথার তথ্য প্রচার করার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার কবিতা ব্যর্থ ও নিকৃষ্টতর হইত। প্রকৃতপক্ষে এ কবিতাগুলি অভিমানের ও বিদ্রোহের কবিতা। কবি বলিতেছেন "হে শাস্ত্রকার, তুমি আমাকে শত সহস্র "না"র মধ্যে জড়াইয়া আমার জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে—তাহা হইবে না। আমি তোমার কথা মানিব না। হে আমার চিত্ত! তুমি কেন বৃথা অসম্ভবকে সম্ভব

করিবার প্রয়াস পাইয়া কষ্ট পাইতেছ? এস বিশ্রাম কর। অর্থহীন তর্ক ছাড়িয়া দিয়া চল আমরা নিভৃতে গিয়া কোনও তরুণীর অধর সুধা পান করিয়া শ্রান্তিদূর করি।" * * এ ক্ষণিকের বিদ্রোহের পরেই আবার মন সেই পুরাতন চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইত। * * * বস্তুতঃ ওমরের দর্শন—ব্রহ্ম মিথ্যা, ইন্দ্রিয়গোচর অনিত্যকে যথাসম্ভব উপভোগ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য—এই শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ওমর কোনও মত প্রচারের জন্য কবিতা লিখেন নাই। তাঁহার কবিতা তাঁহার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সকল কবিতা তাঁহার ব্যর্থ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মাত্র! কিন্তু এ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নহে, এ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে।" ("সওগাত" পত্রিকা; বৈশাখ, ১৩২৭)।

তরিকুল আলম একজন "ফারসি-নবীশ" পণ্ডিতলোক—সেজন্য তাঁর এই মন্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয়। তাঁর মতে ফিট্‌জিরেল্ডের মনের ভাব ওমর খৈয়ামের মনের ভাবের উপর যথেষ্ট ছায়াপাত করেছে। সেজন্য ওমর খৈয়ামের চতুষ্পদী কবিতাগুলির আসল মর্মকথা আলম সাহেব আমাদের শুনিয়েছেন:—"এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি; এই জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি; আমরা কোথা হইতে আসি; কোথায় যাই; কেনই বা আসি; কেনই বা যাই; কেহবা ভাগ্যবান হয় কেন; কেহ চোখের জলে বসন তিতাইয়া একটা দীর্ঘ হতাশের বোঝা বহিতে বহিতে মরে কেন; এ দু'দণ্ডের জীবনের অর্থ কি; ইহার মূল কি? এ সকল প্রশ্ন ওমরের চিত্তে সর্বদা জাগিত। এই সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া তাঁহার কবিচিত্ত তাঁহার বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া বাহির হইবার জন্য সর্ব্বদা আকুলি বিকুলি করিত।

সয়ের আমদম্ আয় খোদা আজ পস্তিয়ে খেশ।
আজ তঙ্ দেলি ও আজ তিহি দস্তিয়ে খেশ॥
আজ নিস্ত্ চুঁহস্ত্ মিকুনি বেরূঁ আর।
জিঁ নীস্তেম বা-হুর্‌মতে হস্তিয়ে খেজ।

হে প্রভু! আমার এ হীন অবস্থায় আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই দুর্ভাগ্য, এই দারিদ্র্য। তুমি নাস্তি হইতে অস্তি সৃষ্টি কর। তুমি আমাকে আনয়ন কর—এই মায়াময় নাস্তি হইতে তোমার সত্য অস্তির

মধ্যে।"—এর আর একটা দিকও ভেবে দেখবার আছে।

বর্তমানে যদি কেও নিছক দেহবাদের বা মনোবিকলনের অজুহাতে আমাদের গৃহের আদর্শ, পবিত্রতা ও নীতিজ্ঞানকে ভাসিয়ে দিয়ে আধুনিকতার মোহে মশগুল হতে চান—তাহলে তিনি শুধু সাহিত্যের নয় সমাজের চক্ষেও নিন্দনীয় হবেন। যৌনপ্রবৃত্তির অশোভন ও উৎকট প্রকাশের প্রতি শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির স্বাভাবিক ঘৃণা আছে বলেই আমরা জানি,—আইনের চোখেও সেরূপ কাজ অপরাধ বলেই গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ বা সুস্পষ্ট নিন্দা কোনও দিক থেকেই ওঠে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সত্য-ভাষণ মনুষ্যত্বের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এ সব তত্ত্বের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু রসসৃষ্টি ও আনন্দ পরিবেশন ছাড়াও শুভবুদ্ধি, রুচি ও হিতাহিত জ্ঞানের পরিবেশক হিসাবেই সাহিত্যের প্রয়োজন ও সার্থকতা। সাহিত্যের গতি প্রকৃতির মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নির্মল ভাবধারার প্রবাহকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজন সর্বজন-স্বীকৃত—এতে করে পাঠকচিত্ত সর্বদা একটি পরিতৃপ্তির আস্বাদ পায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাহাদুরি নিশ্চয়ই আছে, পাণ্ডিত্যও তাতে দরকার কিন্তু সমাজে নৈতিক অপরাধ থাকাও অনিবার্য, তবে সেটাই সমাজের প্রকৃত ও সমগ্র রূপ নয়—বিকলাঙ্গ সমাজকেই রচনার একমাত্র উপজীব্য করলে ভদ্র-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির রুচিজ্ঞান আহত হওয়া অস্বাভাবিক নয়—কারণ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নীতি-জ্ঞান সাহিত্যে উপেক্ষিত হতে পারে না। পাঠক-মনকে প্রলুব্ধ করে' লেখক যদি নিজের নিরুদ্ধ বা অবদমিত প্রবৃত্তি ও লালসার কাল্পনিক পরিতৃপ্তির ছবি আঁকেন, তাহলে তাতে শুধু যে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে তাই নয়—তাতে স্বল্পকালের জন্য চিত্তহরণ করা সম্ভব হলেও নিকৃষ্ট আবেদনের জন্য সে রচনা কোনও দিনই সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে না। আমাদের পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি এই সিদ্ধান্তের দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য অথবা প্রায়-বিরল ঘটনাকে উপলক্ষ করে পাঠকসাধারণের মনকে আকর্ষণ করার যে প্রয়াস তাকে মনোবিকলন বা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বলে না। সৎ বা মহৎ সাহিত্যেরও এ কাজ নয়—এই কথাই আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি।

সাহিত্য-শিল্পীর দায়িত্ব তার সৃষ্টি বা রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—অনুভূতি, ভাবুকতা, 'টেকনিক', সূচনা ও সমাপ্তির সঙ্গতি রক্ষা ক'রে তিনি যা লেখেন—সাহিত্যের বিচারে তা' উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হতে পারে। গ্রন্থ প্রকাশকের দায়িত্ব লেখক অপেক্ষা অনেক দিক থেকে গুরুতর। সমাজ-পরিবেশে যে বৃহত্তর ও ব্যাপক কল্যাণের আমরা চিন্তা করি—প্রকাশকের দেখা কর্তব্য যে প্রকাশিত গ্রন্থের, দ্বারা সে কল্যাণ কতখানি সাধিত বা ব্যাহত হচ্ছে। অহিতসাধনের দায়িত্ব লেখকের উপর সম্পূর্ণ চাপিয়ে দিয়ে প্রকাশক নিষ্কৃতি পেতে পারেন না—এই জন্যই লেখক ও প্রকাশক উভয়েই সমাজের ও আইনের চোখে অপরাধী বলে গণ্য হয়ে থাকেন। চারিদিকের চাপে একেইতো আমাদের সমাজ ভেঙ্গে পড়ছে—সে সমাজকে টেনে তুলতে পারে সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্যও যদি বিপরীতমুখী হয়—তাহলে আমরা আজ দাঁড়াব কোথায়? আমাদের মনে রাখা দরকার যে "সাহিত্যের জন্য জীবন নয়—জীবনের জন্যই সাহিত্য।"

গণ-সাহিত্য

আমাদের আধুনিক সাহিত্যিক সমাজে "গণ-সাহিত্য" বলে' একটা কথা উঠেছে—তাঁরা আমাদের পুরাতন কালের "লোকসাহিত্য"এর কথাটা তুলতে একেবারেই ভুলে যান। শুধু "গণ"এর সাহিত্য হলেই চলবে না—গণ-মানসের সাহিত্য হওয়া চাই—গণ-বুদ্ধির অধিগম্য ভাব ও ভাষার সাহিত্য হওয়া চাই—নতুবা নামকরা বড় ব্যারিষ্টার জজের এজলাসে এসে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দিয়ে মামলায় সওয়াল জবাব করলে সহযোগিরা তা' বুঝবেন, হয়তো তারিফও করবেন কিন্তু যার বা যাদের জন্য ওকালতি তারা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কড়ি-কাঠ গুণে যাবে—কারণ সে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গুরুগম্ভীর এবং সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য কথামালা অনুধাবন করার মতো—না আছে তাদের শিক্ষা, না আছে তাদের বুদ্ধি—না আছে তার অর্থ বা তাৎপর্য গ্রহণের মতো তাদের মানসগঠন ও ভাবগ্রহণের শক্তি। কিন্তু প্রাচীন লোকসাহিত্য সাধারণ লোকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ছিল, তার কারণ সামাজিক আদর্শের সঙ্গে তাদের ভাবের যে যোগাযোগ ছিল তার উপর ভিত্তি করেই হতো আমাদের সেকালের লোকসাহিত্য রচনা। আজ আমরা "গণ-সাহিত্য"এর নামে লোক-সমষ্টির সহজ-দাহ্য ভাবাবেগে অগ্নি সংযোগের কাজে লেগে গেছি—কিন্তু তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে হলে যে ধীর স্থির ও শুভ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তার প্রতি উপেক্ষা করে অনায়াসে বাজিমাৎ করার চেষ্টায় আছি। সেকালে এই শ্রেণীর পাঠকদের জন্য আমাদের ভাব প্রকাশের ভঙ্গী ছিল অপেক্ষাকৃত সরল ও অনাড়ম্বর এবং সেজন্য নিঃসঙ্কোচও বটে। নির্দিষ্ট সংখ্যক সমভাবাপন্ন হৃদয়ের কাছে আধুনিক ভাবুকতার আকর্ষণ থাকলেও—রসিকচিত্তে তার আবেদন কতখানি আছে সেটাই ভাববার কথা। সংশয় আধুনিক লেখকদেরও আছে তাই তাঁদের সাহিত্য নিঃসঙ্কোচ নিবেদন নয়—ভাষার জটিলতার সঙ্গে ভাবের দুর্বোধ্যতা সেজন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে তাঁদের কাছে। আজ যদি শুধু যুগধর্মকে আশ্রয় করে আমাদের আধুনিক সাহিত্য এবং বিশেষ করে আমাদের কাব্য সর্ব-

সাধারণের কাছে অনধিগম্য থাকে—তাহলেও তা আপামর সাধারণের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে—এ প্রত্যাশা অবশ্যই অসঙ্গত। এর আর একটি মূল কারণও আছে। আমাদের এযাবৎ কালের সাহিত্যে ভাবসাধনা বলে একটা বস্তু ছিল, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তার একান্ত অসদ্ভাব ঘটছে আজকালকার আধুনিক নামধেয় সাহিত্যে ও কাব্যে। সাহিত্য বা কাব্য ব্যক্তি বিশেষের কল্পনাশক্তি ও ভাবস্মৃতি থেকে উদ্ভূত না হয়ে সহস্র কবি সাহিত্যিকের সাধনার ফলস্বরূপ হলে, তবেই তাকে বলা যাবে মহৎ সাহিত্য বা মহৎ কাব্য। নূতনত্বের সন্ধান অবশ্যই দরকার কিন্তু তা' পুরাতন ভাবকে নির্বাসন দিয়ে নয়; পটভূমিকে সরিয়ে দিয়ে একটা ভ্যাকুয়াম (Vacuum) অর্থাৎ শূন্যের উপর সাহিত্য সৃষ্টি চলবে—এমন উদ্ভট কল্পনা করাও কঠিন। যা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও সামান্য—আর্ট বা শিল্পের ছোঁয়া লেগে তা অসামান্য রূপ ধারণ করে—কিন্তু এই "নিও-গণ-সাহিত্যিকরা" তুচ্ছকে আরো তুচ্ছ করে দেখান—সামান্যকে আরও অকিঞ্চিৎ করে' দেখান—তাঁদের আত্মশ্লাঘা এই যে তাঁরা গজদন্ত মিনারে বাস করেন না—মাটিকে ধূলাকে কদর্য কর্দম ও পল্বলপঙ্ককে তাঁরা স্বীকার করে নেন বলেই তাঁরা Realist. তাঁরা বলেন—আমরা ধোঁয়ার সৃষ্টি করি না—বস্তুকে তার স্বরূপে প্রকাশ করি। তারা বলেন, মানুষের কথা নিয়েই তাঁদের কারবার—অথচ এযাবৎ কাল তাঁরা মানুষকে তার সত্য স্বরূপে আবিষ্কার করতে পারলেন না—অতএব সেই মানুষের জন্য সাহিত্য রচনার চেষ্টা হাস্যকর বলেই মনে হয়।

গণ-সাহিত্যের বাহন

আমাদের কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরামদাসের মহাভারত, চণ্ডীদাস রামপ্রসাদের গান, দাশু রায়ের পাঁচালী, কথকতা, যাত্রা, পালাগান, এমন কি আগমনী ও বিজয়ার গান, ব্রতকথা, এ সকল গণ-সাহিত্যের দাবি রাখে—এখানে রসোত্তীর্ণতার কথা ওঠে না—লোক-সাহচর্য বা গণ-সংযোগের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কথাই ওঠে।

প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাঁর "গণ-সাহিত্য" সম্পর্কে আলোচনায় কতকগুলি মুখ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন;

উপরে আমরা গণ-সাহিত্যের পর্যায়-ভুক্ত যে বইগুলির উল্লেখ করলাম সেগুলি সমস্তই কবিতায় লেখা। তাই প্রমথবাবু ঠিকই বলেছেন…"গণ-সাহিত্যের বাহন ছন্দ। * * * সাহিত্য গণ-সাহিত্য হইয়া উঠিতে গেলে প্রথমে ছন্দ-বাহন আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সে আশা গণ-তন্ত্রের যুগে আছে বলিয়া মনে হয় না। গণ-তন্ত্রের ভাষা গদ্য, গদ্য চিন্তার বাহন। পদ্য অনুভূতির বাহন। চিন্তায় মানুষে মানুষে স্বাতন্ত্র্য ; অনুভূতিতে মানুষে মানুষে ঐক্য।" সেজন্য তাঁর মতে গণ-সাহিত্যের বাহন হবে পদ্য,—তা' মানুষকে একানুভূতির অলক্ষ্য বন্ধনে যে শুধু দৃঢ়-সংসক্ত করে রাখবে তাই নয়—সে সংসক্তি সমাজের অখণ্ডতাকে রক্ষা করবে। তিনি বলেছেন সেকালকার "সমাজ অখণ্ড ছিল, ছন্দ অখণ্ড সমাজের বাণীরূপ ছিল, সমাজের অখণ্ডতা বজায় রাখার শক্তিও তাহার ছিল। আধুনিক সমাজ বহু খণ্ডিত, ছন্দ এখানে পঙ্গু।" ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের "ছন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য" সম্পর্কে আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা বলেছি যে মানুষের একান্ত কাম্য আনন্দের সন্ধান পাই আমরা ছন্দে —সে ছন্দ কবিতারই হোক আর জীবনেরই হোক, তাতে কিছু মাত্র আসে যায় না।

গণ-সাহিত্যের স্বরূপ

বর্তমান গণ-সাহিত্যের প্রবক্তরা সাহিত্যে সদাচার বা শিল্পধর্মের দাবি মানেন না কিন্তু জীবনের খণ্ড উপলব্ধি কোনও সৃষ্টিরই সহায়ক নয়। জীবন-ধর্মের মূল নীতিতে যাদের বিশ্বাস নেই—অতীত নেই, ভবিষ্যতও নেই—একেবারে প্রত্যক্ষ বস্তুসর্বস্ব বর্তমানকে নিয়ে যারা গণ-সাহিত্যের ধ্বজা তুলে—আমরাই জনগণের একমাত্র 'কহনেওয়ালা' বলে গর্ব করেন তাদের হাতে তৈরি এই প্রকার সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে—প্রমথবাবু তাঁর "বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য" পুস্তকে বলেছেন—"এই শ্রেণীর সাহিত্যকে বিশ্লেষ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহার প্রধান উপজীব্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, দেশের সাম্প্রতিক দুর্ভোগ ও দুর্ভিক্ষ কিংবা জনগণের কাল্পনিক দুঃখ-দুর্দশা। * * * গণ বলিতে বুঝি অখণ্ড, সমগ্র সমাজ ; আর গণ-সাহিত্য বলিতে বুঝি, যে সাহিত্যের রস অখণ্ড সমগ্র সমাজ অনায়াসে গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাহা

হইলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে, সাহিত্য কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন স্রষ্টার হাতে গণ-সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। সাহিত্য যদি হয় রসাত্মক বাক্য, গণ-সাহিত্য, এমন সর্বানুভূতি-সম্পন্ন রসাত্মক বাক্য যাহার রস সর্বজনের পক্ষে অনায়াসলভ্য।" তিনি এ সম্বন্ধে আরও বলেছেন,—

"গণ হইতেছে সর্বজন—যাহাকে পূর্বে আমরা অখণ্ড সমগ্র সমাজ বলিয়াছি, কাজেই গণ-সাহিত্য গণ-সাপেক্ষ। সমাজের অখণ্ডতা বা সর্বজনের একতাই এই সাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা। * * * এখন আমরা যে সমাজে বাস করিতেছি তাহা কি গণ-সমাজ? তাহা কি অখণ্ড? তাহাকে কি সমগ্র বলা চলে? যদি তাহা অখণ্ড ও সমগ্র না হয় তবে এই সমাজের লেখকের পক্ষে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব?"

সেজন্য তিনি বলেছেন যে বর্তমান গণসাহিত্যে "প্রকৃত গণ-সাহিত্যের সার্বজনীন প্রেরণার অভাসমাত্র নাই—" "আকাশের তারার শাশ্বত দীপ্তি ইহাদের নাই—আছে দলীয় বাষ্পের বিষ-নিশ্বাসে কলুষিত সর্বনাশের অভিমুখে আকর্ষণ করা জলা-জমিতে সঞ্চরণকারী আলেয়ার চোখের ইঙ্গিত।" প্রথমবাবু তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যে যে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন-তাতে 'গণ-সাহিত্য'এর স্বরূপ নির্ণয়ে বিশেষ সহায়তা করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস—এবং সেই বিশ্বাসের বলেই আমাদের বলতে হচ্ছে যে এঁদের দ্বারা গণসাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া আপাততঃ অসম্ভব।

আরও এক কারণে তা অসম্ভব। এই সব আধুনিক গণ-সাহিত্যিকরা শিল্প-ধর্মের তোয়াক্কা রাখেন না। সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার সাহিত্যের সৃষ্টি চলতে পারে না—বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের স্থান সৃষ্টিকার্যে অবশ্যই আছে কিন্তু রসের স্থান সকলের উপরে এবং বস্তুতন্ত্রতার আতিশয্যে সে রসকে—অপরিপক্ক ফল থেকে নিঙড়ে বের করতে গেলে তার তিক্ত ও তীব্র আস্বাদ আমাদের সাহিত্যে, কাব্যে বা শিল্পে অস্পৃশ্য হয়ে থাকবে। মনে রাখতে হবে যে, রসাস্বাদ অপেক্ষা কৌতূহল পরিতৃপ্তি বা প্রণালীবদ্ধ প্রক্রিয়া বা ভঙ্গীকে অধিকতর কাম্য বলে মনে করলে মানসিক উত্তেজনা কাব্য-চর্চার আসল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে ব্যাহত করবে। লঘুচিত্ততা বা অশোভন দম্ভ সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

"ডেমোক্রেসি"র আদর্শ সাহিত্যের আদর্শ নয় কারণ তাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভাব প্রবল থাকলেও সামাজিক মিলনক্ষেত্রে প্রীতি অপেক্ষা সেখানে ব্যক্তিসত্তার প্রভাব বেশী। এই ব্যক্তিসত্তার প্রভাব অবশ্য সাহিত্যসৃষ্টির কাজে বাধা না হয়ে সহায়ক হতে পারে—যেখানে তার কাজ রসস্রষ্টার এবং বৃহৎ ও ব্যাপক ক্ষেত্রে সে রসের পরিবেশন ; ব্যক্তি সেখানে বড় নয়, স্বাতন্ত্র্য সেখানে মানবিকতার সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়, সেখানে কোনও নিয়ন্ত্রণ বা প্রণালীবদ্ধ অনুশাসন নেই, মত বা মতবাদের স্থান নেই ; সেখানে কাব্য বিশুদ্ধ ও নির্মল অনুভূতিতে গভীর ও মর্মস্পর্শী হয়ে লোকচিত্ত জয় করে থাকে।

নবসৃষ্টির আহ্বান

সেদিন পথ ছিল দুর্গম, গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে সংকটাপন্ন—তবুও তখন আমাদের যাত্রা শাসন-সন্ত্রাসিত পথে বাধা নিষেধ মানে নি—আজ আমাদের যাত্রা-পথের বিপদ কেটে গেছে, দুর্গমতাও আজ তিরোহিত—আজ আমাদের যাত্রা স্বাধিকার-প্রাপ্ত রাষ্ট্রে অভ্যুদয়ের পথে,—কিন্তু দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে রাখার কর্তব্য আজ শুধু একান্ত আবশ্যকই নয়—পরন্তু অপরিহার্য। আজ জাতীয় কাব্যের উপাদান হবে ভিন্নতর, কারণ পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই উপাদানের বৈচিত্র্যে অধুনাতন প্রেরণা ও উপলব্ধি স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। সেই স্বাতন্ত্র্যের দিকে আমাদের আকর্ষণেও নূতনত্ব দেখা দেবে। কিন্তু আমাদের সৃষ্টির কাজ অতীতকে বর্জন করে নয়—শুধু বর্তমানকেই একান্ত ভাবে গ্রহণ করেও নয়—নূতন ক্ষেত্রে, নূতন পরিবেশে, নূতন প্রেরণা এবং প্রত্যয়ে লোক সাহিত্যের সৃষ্টি হবে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। এটাই হচ্ছে আধুনিক যুগের দাবি। পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন—

"We have to fit in with fast-moving age in which we live, if we want to survive. What is needed is to bring about a synthesis and a balance between what was good and enduring in India's past and the requirements of the present age. Science is undoubtedly a probe into nature to find the powers it yields. This probe had resulted in discoveries and their application during the last 150 years had changed the face of the earth and was daily influencing it. That is the spirit of the age. We must accept the age in which we live, but at the

same time we should hold on to all the basic ideals which have wonderful meaning to us and all the world and which have been proclaimed by India through the ages and which have been proclaimed by Rabindranath."—[Visva Bharati Convocation, 23.12.59]

দেশ ক্রমেই এখন জীবনযাত্রার challengeএর সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা এখন এক প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে চলেছি। যন্ত্রের যুগ এসেছে একথা সত্য কিন্তু মানুষই যন্ত্র তৈরি করেছে, যন্ত্র মানুষকে তৈরি করেনি। কাজেই সচল ও সক্রিয় মনের দরকার—যে মন নূতন নূতন পরিবর্তনকে নূতন নূতন ভাবধারাকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দেশের মাটি এবং জাতীয় জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে নিজের সত্তা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাবে। জাতীয় জীবনধারা থেকে কোনও সমাজের মূল-ভ্রষ্ট হওয়ার মতো বিপদ আর কিছু নেই। অতএব জাতীয় জীবনের আদর্শকে দেশের মাটিতে বদ্ধমূল করে রেখে নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলতে হবে।

জাতির মতোই বহুদিনের বাধামুক্ত সাহিত্যিক জীবন আজ বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে—সম্মুখে অনতিক্রান্ত সুদীর্ঘ পথ—পাথেয় সংগ্রহ করে চলতে হবে সৃষ্টি ও সংগঠনের পথে। পথ চলবার মতো শক্তি চাই—সংযম চাই, তিতিক্ষা চাই,-চাই সহিষ্ণুতা ও চিত্তের ঔদার্য ও প্রশান্তি। অসংখ্য সংকট ও বিপর্যয়ের মধ্যেই সে গুণসম্পন্নতা অর্জন করতে হবে, রক্ষা করতে হবে। আজ দেশের কোটি কোটি মানুষ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আত্মা তাদের তৃষ্ণাকাতর, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাদের নৈরাশ্য ও ক্ষোভ, অতৃপ্তি ও অবসাদ তাদের বিভ্রান্ত করছে। সাহিত্যসেবার দ্বারাই তাদের রক্ষা করতে হবে ; কবি, সাহিত্যিক ও কথাশিল্পীদের জীবনে আত্মবিকাশের এক মহা মুহূর্ত আগতপ্রায় ; আমাদের আত্মরক্ষা এবং স্বজন ও স্বদেশীয়দের রক্ষার অন্যতম উপায় জাতীয় সাহিত্য এবং সেই পর্যায়ে লোক-সাহিত্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের এই মাটির মা, এর সোনার শস্যক্ষেত্র, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে, এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে

কুরে এনে দিয়েছে। আমি এই পৃথিবীকে ভালবাসি—স্বর্গের উপরে আড়ি করে আমি দরিদ্র মায়ের ঘর ভালভাসি।"

আমাদের দেশকে, সেই মাটির মাকে আজ তার প্রাণধর্মে জাগ্রত কর হে বাংলা দেশের কবি—দেশ জাগুক আজ তার শাশ্বত সত্তায়, তার বিশিষ্ট অস্তিত্বে ও আস্তিক্য বুদ্ধিতে; আজ তার নূতন দীক্ষা হোক তোমার হাতে। কবি, তুমি আজ আশা উৎসাহ ও আনন্দের নূতন বাণী শুনাও—শুধু আজিকার জন্য নয়, আগামীকালের অনাগত ভবিষ্যতের জন্য।

জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, জাতির চেষ্টা, উদ্যম ও কর্মের আদর্শ এবং লক্ষ্যের মূর্ত প্রকাশ হোক কবি, তোমার রচনায়। তুমি হও সংস্কৃতির বাহক ও ধারক, তোমাকে নিয়ে দেশের ঐতিহ্য গড়ে উঠুক আজ তার নূতন অর্থে, নূতন তাৎপর্যে। দেশের প্রাণ-ধর্মকে তোমার কবি-মানসের অবারিত আলোক-সম্পাতে সকলের দৃষ্টিগোচর কর। যারা আজ মাকে চেনে না তাদের মাকে চেনাও, তাদের দৃষ্টিতে আসুক মাতৃদর্শনের শক্তি, মনের পঙ্কপল্বলে জাগুক জীবন-চাঞ্চল্যে টলমল প্রস্ফুটিত চৈতন্য শতদল,—তাদের ভাবধারায় আসুক—"গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি"র দুকূলপ্লাবী তরঙ্গ-ভঙ্গিমা। স্বদেশের মৃত্তিকারসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক তাদের প্রাণ। দেশের রূপময়ী ভাবময়ী মূর্তি তার সকল ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত হোক সকলের মনে।—"মায়ের সোনার মন্দিরে" আজ দুয়ার খুলে দাও কবি, তোমার হাতেই তো তার চাবিকাঠি; মায়ের "মরণ-হরণ-বাণী" আজ শুনাও তুমি কবি—আজ আহ্বান এসেছে তোমার দ্বারে—নবসৃষ্টির আহ্বান—নবযুগে,—নব ভারতের নবীন প্রভাতে।

কাব্যে দেশাত্মবোধ

জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ এক কথা নয়—জাতির বৈশিষ্ট্য—তার চিন্তার ধারা, ভাবাবেগের প্রবলতা, তার ধ্যান-ধারণা, চারিত্রিক বল ও লৌকিক আচরণ—নানাভাবে তার সাহিত্য, কাব্য, নাটক, ইতিহাস ও উপন্যাসে আপনার বিশিষ্ট ছাপ রেখে যায়—। মানুষ মরণশীল—কিন্তু তার সাহিত্য অমর—তাই মানুষের দেহাবসানের পরও তার প্রাণ-স্পন্দন সাহিত্যধারায় তরঙ্গায়িত হতে থাকে; তারই মধ্যে পরবর্তী যুগের মানুষ পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পায়। এক হিসাবে ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্যে আমরা জাতির সত্যকার পরিচয় অধিকতর লাভ করি—কেন না ঘটনাবলীর উপর ঐতিহাসিকের যে দৃষ্টি তা কখনও কখনও শক্তিমান রাজশক্তির অনুগ্রহ বা নিগ্রহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া অসম্ভব নয়—কখনও বা লোক-চরিত্রের বৈচিত্র্য ও মানবতার অপূর্ব বিকাশ-ভঙ্গিমার অনুভব-শক্তিও ঘটনা-সংঘাতের অত্যধিক চাপে বিকৃত হয়ে পড়ে।

কিন্তু কবির কাব্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকে উদ্ভূত,—দেশপ্রীতি ও দেশাত্ম-বোধ থেকে রচিত, স্বাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিকশিত। এইজন্য তা একান্তই অনুভূতির সামগ্রী; এরই মধ্যে দেশাত্মবোধের সন্ধান পাই—কিন্তু জাতীয়তার অভিব্যক্তি দেখি জাতি গঠনের কর্ম্মক্ষেত্রে। আমরা দেশাত্মবোধ থেকে বলি—

"আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে
দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদ পুরে
ভগ্নগৃহে; সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে
কুব্জপৃষ্ঠে নত শিরে; সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জ্জনী-সঙ্কেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া; লইয়াছি শির পেতে
সহস্র শাসনশাস্ত্র;
সঙ্কুচিত কায়া
কাঁপিতেছে রচি' নিজ কল্পনার ছায়া,

সন্ধ্যার আঁধারে বসি' নিরানন্দ ঘরে
দীন আত্মা মরিতেছে শত লক্ষ ডরে!
পদে পদে ত্রস্ত চিত্তে হয়ে লুণ্ঠ্যমান
ধূলিতলে........." (নৈবেদ্য)

আর জাতীয়তার ভাবাবেগে বলি—

"কে লবে প্রসন্নমনে নিগ্রহের ফল অনুগ্রহ
তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি সহ
বর্বর প্রভুর হাতে দাসত্বের তুচ্ছ পুরস্কার?
দাবি যদি না থাকে আমার—
দাক্ষিণ্যের সিংহাসন তলে
আমায় মুক্তির দান মেগে লব নয়নের জলে?"
(রক্তরেখা)

জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ উপলব্ধির স্থানভেদে স্বতন্ত্র, কিন্তু এই দুইটির পরস্পর সম্মিলন ও পরিণতির মধ্যে দেশাত্মবোধক কাব্যের উদ্বোধন হয়ে থাকে—ইংরাজীতে যাকে national বা patriotic poems—বলা হয়; কিন্তু এ দেশের জলবায়ুতে patriotic বা nationalএর একটি মৌলিক ব্যাখ্যাই বহুদিন প্রচলিত ছিল—তাকে বলা হোত seditious বা রাজদ্রোহ-মূলক—কাজেই তখন দেশাত্মবোধক বা 'জাতীয়' কবিতার আলোচনার পথ দুর্গম ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মানুষ চিরদিন নিজের দেশকে, নিজের জাতিকে ভাল বেসেছে। আপনার ধর্ম, আপনার সমাজ, আপনার ভাষা ও সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠান, এসবের প্রতি মানুষের যে অনুরাগ তা অনেক সময় সাংসারিক বুদ্ধির দ্বারা অনুমোদিত নাও হতে পারে; মা যখন আপনার কালো ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে 'কালো মাণিক' বলে আদর করেন তখন যুক্তির তৌলদণ্ডে ওজন করে তাঁকে মিথ্যাভাষিণী প্রতিপন্ন করা যেতে পারে, কিন্তু এই অতিভাষণই ভালবাসার প্রাণ! ইংরাজ কবি কুপার যখন বলেন 'England with all thy faults I love thee still' তখন ইংলণ্ড যে অনেক দোষের আধার তা কবি স্বীকার করেই নেন, তবুও তিনি ইংলণ্ডকে ভাল না বেসে পারেন না! স্কচ্ কবি ওয়াল্টার স্কট্ পাহাড় পর্বত ও জঙ্গলপূর্ণ উষর ক্যালিডোনিয়ার

সৌন্দর্য সমস্ত প্রাণ দিয়ে উপভোগ করে গিয়েছেন। আপনার জন্মভূমির প্রতি এই যে অহেতুক অনুরাগ, এটা মানব-মনের অতি স্বাভাবিক প্রবণতা—শুধু মানবের কেন, মূক প্রকৃতির মধ্যেও এই প্রবণতার পরিচয় পাই। বাংলার সরস মৃত্তিকায় যে বৃক্ষ আপনার পত্র-পুষ্প-ফলে বনভূমিকে রোমাঞ্চিত করে তোলে, রাজপুতানার কঠিন মৃত্তিকায় কে তার জীবনের আশা করতে পারে ?

মাটির মায়া ও খাঁটীর মায়া

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রিক গৌরব অপেক্ষা আত্মিক গৌরবকে চিরদিন প্রাধান্য দিয়ে এসেছে, কাজেই ভারতবাসীকে মাটির মায়া অপেক্ষা খাঁটীর মায়া অধিক আকর্ষণ করেছে। সেজন্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাই না—কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলিবে না যে ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী’ কথাটার জন্ম ভারতবর্ষেই এবং এই ভারতেরই এক রাজা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিতে না চেয়ে সবংশে নির্বংশ পর্যন্ত হয়েছিলেন! মাটির প্রতি এই অত্যুগ্র আকর্ষণ প্রাচীন গ্রীক্ ছাড়া আর কোনও জাতির সাহিত্যে নেই। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলা আবার ভাবপ্রবণতার জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের বাণী নেই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রধানতঃ দেখি নানাবিধ উপধর্মের কাহিনী;—গৃহদেবতা, কুলদেবতা, গ্রাম্যদেবতা; সংখ্যাতীত দেবতার ইতিহাসেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ভরপুর—তা থেকে বাংলার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের আভাস পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনেরও নিখুঁত চিত্র পাই—কিন্তু রাষ্ট্রিক জীবনের পরিচয় এ সকল গ্রন্থে একান্ত দুর্লভ। এই জীবনের প্রথম পরিচয় পাই ঘনরামের ‘ধর্ম্ম মঙ্গলে’—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ রাজা লাউসেনের যুদ্ধযাত্রার ইতিহাস লিখে তিনিই প্রথম করুণরস-প্রধান বাংলা কাব্যে বীররসের প্রবর্তন করেন। তাঁর অব্যবহিত পরের কবি ভারতচন্দ্রও রাজা প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব ও স্বাদেশিকতার বিবরণ কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন—

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
কেহ নাহি আঁটে তায়, নাহি মানে পাতশায়
ভয়ে সব নৃপতি দ্বারস্থ॥"

তাঁর জীবনকালে মুসলমান রাজত্বের অবসান আরম্ভ হয়। বিদেশীয় বর্গীর আক্রমণে বাংলা তখন ছিন্ন ভিন্ন—বাঙালীর সাংসারিক জীবন তখন কিরূপ বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার আভাস আমরা পাই বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত 'ছেলে ভুলান' ছড়ায় এবং গানে—"বর্গী এল দেশে, খাজনা দেব কিসে ?"

"হু হু করে' বর্গী এল, ঘরবাড়ী সব লুটে নিল।
আমরা সকল লোকে মারিব বর্গীকে॥" ইত্যাদি—

নিজের সাংসারিক সুখ-অপহরণকারী বিদেশীয় শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আবশ্যকতা সেদিন বাঙালী যে অনুভব করেছিল তা এই সকল গান ও ছড়া থেকে বোঝা যায়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাঙালী সমগ্র বাংলা যে এক এবং অখণ্ড দেশ এবং সেই দেশ যে আমাদের জন্মভূমি, তেমন ভাবে সেটা উপলব্ধি করে নি। এটা প্রথম দেখলাম পুরাতন যুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনার যুগসন্ধী কালে কবি ঈশ্বর গুপ্তে। তিনিই প্রথম লিখলেন—

"জান' না কি নর তুমি জননী জনমভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে—
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তান জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে ?"

এই নদী-সরোবর-বৃক্ষ-লতা-প্রান্তর-সমন্বিত বাংলা দেশকে মূর্তিময়ী দেবীরূপে কল্পনা করা আজ কারও কাছে নূতন না ঠেকতে পারে, কিন্তু সেদিনকার বাংলা সাহিত্যে এটা শুধু নূতনই ছিল না, বিস্ময়করও ছিল !

ঈশ্বর গুপ্তের যুগটি বাংলার জাতীয় জীবনে একটি বিপর্যয়ের যুগ। এক দিকে প্রাচ্যের আদর্শ, অন্য দিকে পাশ্চাত্যের আদর্শ—এই উভয়বিধ আদর্শের সংঘাতে দেশে তখন হট্টগোলের অন্ত ছিল না। এই বিভেদের কুফল চিন্তা করে গুপ্ত কবি দেশবাসীকে বলছেন—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ' দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ যত্ন করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুরে ফেলিয়া॥"

দেশবাসী সম্বন্ধে যেমন, দেশের ভাষা সম্বন্ধেও তেমনি অবহিত গুপ্ত কবির সমসাময়িক প্রসিদ্ধ টপ্পা-লেখক নিধুবাবু লিখছেন—

"নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা॥
নানা জলাশয়ের নানা নীর।
বিনে ধারার জল আশ মিটে কি চাতকীর॥"

আধুনিককালে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অথবা অতুল প্রসাদ সেন বাংলা ভাষার উপর গান রচনা করেছেন। কিন্তু সেকেলে নিধুবাবুর এই গানে বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালীর যে নাড়ীর নিগূঢ় যোগটুকু আছে তা শুধু সুন্দররূপেই ব্যক্ত হয়নি—তখনকার দিনে সেটা সম্পূর্ণ অভিনব ছিল।

এর পর এল হিন্দু কলেজের যুগ—জাতীয় জীবনে এই সময় উদ্দাম সাহেবিয়ানার ঢেউ এসেছিল ; ইংরেজী বলতে পারলে, ইংরেজী ধরণে চলতে পারলে তখন বাঙালী নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই সময়েই বাংলার সাহিত্য অপ্রত্যাশিত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল এবং সেই উন্নতির মূলে ছিল প্রবল স্বদেশানুরাগ! পাশ্চাত্য জাতির সাহিত্য ও ইতিহাস বাঙালীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—বাইরণ, স্কট্, মূর, সাদে প্রভৃতি কবিদের রচিত ঐতিহাসিক উপাখ্যান সমূহের আদর্শে তখনকার শিক্ষিত বাঙালী ভারত ইতিহাসের গৌরবময় অংশসমূহ কাব্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু সে কথা পরে বলছি।

এতদিন পর্যন্ত বাঙালী স্বদেশকে ভালবেসেছিল সত্য, কিন্তু তার ভালবাসা প্রকাশের উপযোগী কোন সুনিয়ন্ত্রিত ভাষা ছিল না—সেই ভাষা সৃষ্টি করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা মা'র যে মূর্তি দেখিয়েছিলেন তা তাঁর মৃণ্ময়ী মূর্তি—সেই স্থূল মূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করল বঙ্কিমের 'বন্দে-মাতরম্'। শক্তিস্বরূপিণী চিন্ময়ী অপরূপা যে মাকে আজ আমরা

জানি সে মাকে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরলেন। ঐ মায়ের অতুলনীয় রূপ-শ্রী—বঙ্কিমেরই আবিষ্কার।

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্
*　　　　*　　　　*
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥"

অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে যে 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বলেছেন তা মোটেই অত্যুক্তি নয়—তাঁর অসাধারণ পূর্বদৃষ্টি ছিল। অর্ধশতাব্দী পরের সময়কে তিনি বর্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন; 'কমলাকান্তে', 'দেবী চৌধুরাণীতে', 'মৃণালিণীতে', এবং 'আনন্দমঠে' তার পরিচয় আছে। তাই বাংলার জাতীয়তাবোধে বঙ্কিমচন্দ্রের দান সম্বন্ধে পৃথকভাবে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্কিমের স্বাদেশীকতা আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—তার বাস্তব দিকটা দেখালেন গুপ্ত কবির অন্যতম শিষ্য দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' আজ আর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, আর্টের মাঠকাঠিতে নাটক হিসাবে এর মূল্য যাই হোক না কেন সেকালে নিরন্ন দরিদ্র কৃষকের ব্যথাকে এমনভাবে প্রাণ দিয়ে অনুভব আর কেও করেনি—যে অনাচার অত্যাচারের প্রতিবাদে নীল-দর্পণের জন্ম সে অনাচার আজ চলে গিয়েছে, কাজেই তার বীভৎসতা আজ আমরা ঠিক বুঝতে পারি না—কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, এই নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করবার অপরাধে লং সাহেব কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষে গ্রাম্য কবি ধীরাজ লিখেছিলেন—

"ওয়েলস্ অবিচার ক'রে, নির্দ্দোষী লংকে ধ'রে
ছ'টি মাসের জন্য মেয়াদ দিয়েছে"—

তদ্ভিন্ন 'সুরধুনী' কাব্যে' দীনবন্ধু প্রাচীন ভারতের গৌরব-কাহিনীসমূহ লিপি-বদ্ধ করে গিয়েছেন—

"কোথায় জনমভূমি প্রিয় বঙ্গদেশ।
তব ক্ষেত্রে শস্য ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ॥"

এটিও দীনবন্ধুর একটি বাল্যকবিতা।

সে যুগের ঐতিহাসিক কাব্যের মধ্যে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহার', নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' উল্লেখযোগ্য। এমন কি বিজাতীয় আদর্শে পুষ্ট মধুসূদনে পর্য্যন্ত বহু স্থানে দেশাত্মবোধের ইঙ্গিত পাই। সময় পরিবর্তনশীল—কালক্রমে বাংলা কাব্যের আদর্শ পরিবর্তিত হতে চলেছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত বেঁচে আছে রঙ্গলালের—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়"

অথবা

"কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়
তিলেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়।"

কবি হিসাবে হেমচন্দ্র এখন কেবল 'জীবন-সঙ্গীত'এর জোরে পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীর মধ্যে বেঁচে আছেন, কিন্তু এই উপেক্ষিত হেমচন্দ্রই একদিন আত্মবিস্মৃত, অসাড় পঙ্গু দেশবাসীকে গম্ভীর ভেরী নির্ঘোষে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—

"বাজ্‌রে শিঙা বাজ এই রবে,
সবাই উন্নত এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

*   *   *

চীন ব্রহ্মদেশ নবীন জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান।
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!"

হেমচন্দ্রের 'বৃত্র সংহার'এও দেবাসুর যুদ্ধের রূপকে বিজাতীয় শত্রুকর্তৃক আপনার জন্মভূমি অধিকৃত হওয়ার মর্মান্তিক করুণ কাহিনী আছে—অন্ততঃ স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার এইরূপই অনুমান করেছিলেন।

নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধ তাঁর কাব্যে অবলম্বিত বিষয় হতেই উপলব্ধি হবে। যে পলাশীর যুদ্ধপ্রাঙ্গণে বাঙালী তার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা নিঃশেষে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিয়ে ম্লান মুখে আপনার গৃহকোণে ফিরে এসেছিল, সেই পলাশীর যুদ্ধই তাঁর কাব্যের বিষয়-বস্তু। মুর্শিদাবাদ নবাব-প্রাসাদের চত্বরে দাঁড়িয়ে অস্তগামী সূর্যের রক্ত-রশ্মি গঙ্গার বুকে বিচ্ছুরিত হতে দেখে যে ব্যথায় আমরা অশ্রু মোচন করি, সেই অতি নিবিড় ব্যথার অনুভূতি কবি, মোহনলালের কথায় অমর করে রেখে গেছেন—

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি—
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারত-ভাগ্যে দুঃখের রজনী॥"

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নপর নবাব-সৈন্যগণকে ডাক দিয়ে মোহনলাল যখন বলছেন—

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ......"

তখন আমাদের অন্তরও আকুল আগ্রহে এই কথারই প্রতিধ্বনি করে। আমাদেরও মনে হয়—

"আজি এই রণে যদি হয় পরাজয়—
দাসত্ব শৃঙ্খল ভার,
ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়।"

স্বর্গ হতে বিতাড়িত হবার পর মিল্টনের Satan বলেছিল—It is better to reign in hell than serve in heaven.' নবীনচন্দ্রও বলেছেন 'অধীন স্বর্গবাস হইতে স্বাধীন নরক-বাস অনেকাংশে শ্রেয়ঃ।' যা অবশ্যম্ভাবী তাই হয়েছে এবং সেই হৃদয়-বিদারক দুর্ভাগ্যকে ব্যথার অশ্রুতে সঞ্জীবিত করে চিরদিনের জন্য কবি তা আমাদের বুকের মধ্যে রেখে গেছেন।

মধুসূদনের দেশাত্মবোধ এত ব্যাপক ও উদার নয় কিন্তু যে মধুসূদন প্রথম যৌবনে 'I sigh for Albion's fairy shore' লিখেছিলেন, জীবনের অপরাহ্নে বিলাসের লীলা নিকেতন সুদূর ফরাসী দেশে বসে' তিনিই 'শ্যামা

জন্মদা'কে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। বাংলার নদী, মাঠ, পূজা, পার্ব্বণ, বাঙালীর কাব্য, বাঙালীর সুখ দুঃখ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, সেই আকর্ষণের ফল তাঁর সনেট্ গুচ্ছ··· কাব্য হিসাবে অবশ্য মধুসূদনের সনেট খুব উচ্চস্থান অধিকার করতে পারে না, কিন্তু কবি মধুসূদন ও মানুষ মধুসূদনকে চিনতে হলে এই সনেটই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। এই সনেটেই তিনি সমস্ত অন্তরের অনুরাগ ঢেলে প্রার্থনা করে গেছেন—

"জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে"

মধুসূদনের নাম চিরদিন 'মেঘনাদ বধ'এর জন্যই প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। এই মেঘনাদ বধেও স্থানে স্থানে কবির সুগভীর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম স্বর্গে রাবণ-মহিষী চিত্রাঙ্গদার মুখ দিয়ে কবি বলেছেন—

"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য ব'লে মানি
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগাবতী।"

মধুসূদনের যুগ ও রবীন্দ্রনাথের যুগের মধ্যে যে সামান্য সময়টুকু তা বাংলা কাব্যের পক্ষে অত্যন্ত দীনতার যুগ। কিন্তু এ সময়ের বাংলা কাব্যেও দেশাত্মবোধের বাণী আছে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র, দীনেশচরণ বসু প্রভৃতি কবিরা দেশের সুখ-দুঃখ অভাব অভিযোগ আশা-আকাঙ্ক্ষা অবলম্বনে অনেক কবিতা ও গান রচনা করে গেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'সদ্ভাব শতক' কাব্যে লিখেছেন—

"ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ ভবন।
নয় নয় তুল্য তার নন্দন কানন॥
স্বর্গ স্বর্গ করে লোক সার তার নাম।
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম॥"

এই কবিতায় কবি দেশ-বিদেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে সহস্র দোষে দোষী হলেও জন্মভূমির উপর মানুষের একটা সহজাত অনুরাগ আছে। যদুগোপালও লিখেছেন—

"কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর,

সেইরূপ সমুদয় ভুবন ভিতরে
আছে দিব্যস্থান এক অতিমনোহর…
* * *
সেই মম জন্মভূমি জননী সমান।"

যোগীন্দ্র বসু থেকেই উপাখ্যান কাব্য রচনা কমে আসে, তিনিই মাইকেলী decadenceএর শেষ কবি—পৃথ্বীরাজ ও শিবাজীর জীবন-কাহিনী অবলম্বনে তিনি দুইখানি বিরাট কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন—এই দুইখানি কাব্যের এক খানি হিন্দু রাজ্যের পতন, অপর খানি তার অভ্যুদয়ের ইতিহাস, দুইখানি কাব্যেই কবির অত্যুগ্র স্বাদেশীকতার পরিচয় আছে, কিন্তু কবিত্বের অভাবে সাহিত্যে এরা স্থায়ী হয়নি। 'পৃথ্বীরাজ'এ কবি লিখেছেন—

"হিন্দুর দুর্গতিমূলে দুর্মতি হিন্দুর,
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে, দুঃখ দৈন্য হবে দূর!"

কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র জন্মভূমির শোভাসৌন্দর্যের উল্লেখ করে লিখেছেন—

"জননী গো জন্মভূমি তোমারি পবন,
দিতেছে জীবন মোর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
সুন্দর শশাঙ্ক মুখ উজ্জ্বল তপন
হেরেছি প্রথম আমি তোমারি আকাশে।
তোমারি মাটীতে ধরি অনেকের কর,
লিখিতে শিখেছি আমি প্রথম অক্ষর!"

পাঠ্যপুস্তক টেক্সট্বুক কমিটী কর্তৃক অনুমোদিত করার সহজ উপায়স্বরূপ অনেকে প্রাকস্বাধীনতা যুগে দীনেশ বসুর 'রুল বৃটেনিয়া' কবিতাটি কবিতা-পুস্তকে উদ্ধৃত করতেন। কিন্তু তাঁর যা ভাল রচনা তার খোঁজ বড় কেও রাখেন না। তিনি 'কবি-কাহিনী' নামক কাব্যের প্রারম্ভে বীণাকে আহ্বান করে গাইছেন—

"বিরহের গান গেও না আর,
প্রলয় গর্জ্জনে জলদ নিঃস্বনে
গাও বীর গাথা, বীরত্ব সম্ভার!" ইত্যাদি—

কবি রাজকৃষ্ণ রায় লিখলেন—

"রবির কিরণে চাঁদের কিরণে
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চরবে যারে তারে কবে
ভূতলে বাঙালী অধম জাতি॥"

তার পর রবীন্দ্র যুগ—সে যুগে কবির অজস্র দেশাত্মবোধক কবিতার কথা পরে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এই সময় দেশে হঠাৎ রাষ্ট্র-বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে, অনেকে বাংলার জাতীয় জীবনে এই যুগকে 'অগ্নি যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। এই সময়ে জীবনের অন্যান্য অংশের মত সাহিত্যেও একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, বাঙালীর দেশাত্মবোধ সহসা শৈশব থেকে যৌবনে এসে উপনীত হয়। এই আলোড়নের ফলে অসংখ্য কাব্য, নাটক, সঙ্গীত ও কবিতা রচিত হতে থাকে। পুরাণ-প্লাবিত রঙ্গালয়ে তখন গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা' দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার-পতন', 'রাণা প্রতাপ', ক্ষিরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি অভিনীত হতে আরম্ভ হয়। পথে-ঘাটে, সভা-সমিতিতে যে সকল স্বদেশী সঙ্গীত গীত হোত তাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

এই পর্যায়ের প্রথম সঙ্গীত হচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

"মিলে সব ভারত সন্তান
একতান, মন-প্রাণ
গাওরে ভারতের যশো-গান।"

জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরও এই আমলে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গান রচনা করেন। তন্মধ্যে—এই গানটি সুপরিচিত।

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

এ ছাড়া কবি মনোমোহন বসু, গোবিন্দ দাস, কাব্যবিশারদ এবং শিবনাথ শাস্ত্রীও কতকগুলি উদ্দীপনাময় কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন। হয়ত' অনেকে মনোমোহনের নামই জানেন না, কিন্তু সেকালে মনোমোহনের 'সতী' নাটকের বিশেষ আদর ছিল, এই নাটকে তিনি ভারতের কৃষি সম্পদের উল্লেখ করে লিখেছিলেন—

তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে যাহা ছিল দেশে
দেশের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে,
হায় রে বিধি কি কঠিন!

*　　*　　*

দেশলাইটি অবধি আসে তুঙ্গ হ'তে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে-শুতে-নেতে
কিছুতেই ভারত নয় স্বাধীন!"

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস নিশ্চেষ্ট দেশবাসীকে শ্লেষাঘাতে জাগ্রত করে রেখেছিলেন—

"স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়,
এই যমুনা গঙ্গা নদী তোদের ইহা হ'ত যদি
পরের পণ্যে গোরার সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?

*　　*　　*

নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা জন্ম-অন্ধ কানা খোঁড়া
শিয়াল কুকুর দেশের মালিক কোন কালেতে হয়!"

"যমুনা লহরী"র কবি গোবিন্দ রায়েরও একটি প্রসিদ্ধ কবিতা এই সময়ে রচিত—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,
পর দাসখতে সমুদয় দিলে—
পর সুখ তরে নিজ বুক পেতে
পর লৌহ বিনির্ম্মিত হার গলে—
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!"

'হিতবাদী'র কাব্য-বিশারদের—

"আমার যায় যাবে জীবন চ'লে,
জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দে মাতরম ব'লে৷ "

—এককালে বিশেষ জন-প্রিয় হয়েছিল।

কান্ত কবি রজনীকান্ত এবং দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী সঙ্গীতের খ্যাতি কোন দিন নষ্ট হবে না। রজনীকান্তের "নেহাৎ গরীব মোরা নেহাৎ ছোট", "মায়ের

দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার জননী আমার" "ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা" গান বাঙালী কোনও দিনই ভুলবে না।—জাতীয় জাগরণের প্রেরণা সঞ্চারে বাঙালী গীতকাররা যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তার বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।* এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ তার প্রস্তাবনা মাত্র। স্বদেশী যুগের অব্যবহিত পূর্বে ও পরেই আমাদের দেশাত্মবোধক কাব্য ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের "জাতীয়" পদবাচ্য সাহিত্যের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বা তাঁর পরবর্তীকালের জাতীয় কবিরা এই দেশপ্রীতির উৎস সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। একথা আগেও বলা হয়েছে। এমন ব্যাপক ভাবে দেশ, জাতি ও সমাজকে নিয়ে অন্য কোন দেশের সাহিত্যই সৃষ্টির অহঙ্কার করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে, কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে ও প্রবন্ধে নূতন ভাব ও প্রেরণার সঞ্চার করে দেশের সম্মুখে দেশ-দেবতার যে বাণীমূর্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা করলেন তা যেমন অভিনব তেমনি অপরূপ। দেশের অন্তরে যে দেশাত্মবোধ ফল্গুধারার ন্যায় ক্ষীণকায় হয়ে মৃত্তিকার তলদেশে প্রবাহিত ছিল—এযাবৎকাল মাঝে মাঝে তার প্রাণ-চঞ্চলতার আভাস পাওয়া যেত কিন্তু রবীন্দ্রনাথই তাকে পথ দেখিয়ে শঙ্খধ্বনি করতে করতে ভগীরথের ন্যায় লোকলোচনের সম্মুখে উৎঘাটিত করলেন, সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনীতে নূতন প্রাণের সঞ্চার হল—প্রবাহে গতিবেগ এল, অর্ধমৃত জাতি যেন নিজেকে সেদিন নূতন করে আবিষ্কার করে নূতন প্রাণসম্পদের নূতন শক্তি অনুভব করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন নবজীবনের গান, শুনালেন নূতন দিনের নূতন আশার কথা—লৌহশৃঙ্খলের ক্রন্দন-ঝনঝনার মধ্যে আগামী কালের মুক্তির বাণী তিনি পৌঁছে দিলেন দেশের ঘরে ঘরে। তাঁর নৈবেদ্য, কথা ও কাহিনী, তাঁর গোরা, রক্তকরবী—তাঁর রাজা-প্রজা, স্বদেশও সমাজ এবং অজস্র ও অসংখ্য কবিতা ও স্বদেশী সংগীত সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি,

---

* সঙ্গীতে দেশাত্মবোধ।

নূতন চেতনা বহন করে আনল—শুধু স্বাদেশিকতা নয়, দেশপ্রীতি নয়—মানবতার নূতন অর্থ, নূতন পরিচয় পেলাম রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাবলী কবিতা ও নাটক প্রভৃতিতে ; বাংলা সাহিত্যে এসবের তুলনা নেই—বিশ্ব-সাহিত্যেও তার তুলনা নেই। রবীন্দ্র সাহিত্য তাই বাহক হল দেশের রাজনীতির—দেশপ্রীতি ও গণ-মানসের নবতন চৈতন্যের।

বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ—"নৈবেদ্য"এ তিনি দেশাত্মবোধকে আধ্যাত্মিক স্তরে তুলে ধরেছেন—সেখানে একদিকে যেমন তেজ-দৃপ্ত অভিমানের সুর, অন্যদিকে তেমনি দেশ-আত্মার সঙ্গে অন্তর-আত্মার অন্তরঙ্গ আলাপ—। প্রবল অনুভূতি ও গভীর আন্তরিকতায় কবি যখন দেশদেবতার চরণে আত্মনিবেদন করতে গেলেন তখন নিমীলিত নয়নে দেখলেন—তাঁর "আসনখানি মহাজনারণ্য মাঝে অনন্ত নির্জন,—কোলাহল মাঝে তাঁর নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজ" করছে। "সব দুঃখে সব সুখে, সব ঘরে ঘরে, সব চিত্তে, সব চিন্তা সব চেষ্টা পরে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা" "সঙ্গবিহীন দেব" একা বসে আছেন। সেই নিঃশব্দ নির্জন অবসরে কবি প্রাণের গোপন ইচ্ছা নিবেদন করলেন—

* * *

"এই চির-পেষণযন্ত্রণা, ধূলি তলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নত শিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্য্যাদা গর্ব্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো"

অথবা—

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডলকণ্ঠি অলঙ্কার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে! দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ! অস্ত্রে দীক্ষা দেহো

রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃ স্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব বীর বেশে।

পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি, পরবশ্যতার কলঙ্ক, প্রতিদিনকার অপ্রতিহত অন্যায়-বিধানের কাছে অসহায় দেশবাসীর আত্মসমর্পণের পর্বত প্রমাণ লজ্জা, রবীন্দ্রনাথ সে দিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন—

"শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ ভাগ
কলহ সংশয়—
সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়॥"

"স্বদেশী" আমলে রবীন্দ্রনাথ "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী", "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক", এবং পরবর্তীকালে "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী", "বাংলার মাটী বাংলার জল" প্রভৃতি কাব্যধর্মী অসংখ্য গান রচনা করেন। তদ্ভিন্ন এ সময়ে তিনি দেশাত্মবোধক অসংখ প্রবন্ধ ও কবিতাও রচনা করেন। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় দেশের অভাব ও বেদনাকে তিনি যে নিবিড় অনুভূতির রসে উজ্জীবিত করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ—

"বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার!
* * *
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।

বাঙালীর স্বভাবসুলভ ভালমানুষী তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি, তিনি স্নেহাতুরা বঙ্গ-জননীকে ডেকে তাঁর 'শীর্ণ শান্ত সাধু' পুত্রদের 'গৃহছাড়া লক্ষী-ছাড়া' করে দিতে বলেছেন, এই দুঃসহ কাপুরুষের জীবন তাঁর পক্ষে অসহ্য বোধ হয়েছিল! তাই তিনি বলেছিলেন—

"তাহার চেয়ে হ'তাম যদি আরব বেদুইন্"!

আবার বাংলা-প্রকৃতির রমণীয়তার দিকটিও তাঁর লেখনীকে স্নিগ্ধ রস-

সঞ্চারে প্রেরণা দিয়েছে। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'দুই বিঘা জমি'—

"নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি!"

স্থাণু জীবনের নির্মোক ভেঙ্গে বাঙালী সেদিন নিজের দিকে ফিরে চাইল —তার দৃষ্টিতে এল দূরদর্শনের ক্ষমতা, মনের পঙ্কপল্বলে জাগল চেতনা, তার স্তিমিত ভাবধারায় উঠল 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির' কূলপ্লাবী তরঙ্গভঙ্গ—তার সমস্ত প্রেরণা ও গতিবেগ এল প্রধানতঃ বাঙালীর দেশাত্মবোধের গীতা এই নৈবেদ্য থেকে—বঙ্কিমচন্দ্রের পর স্বদেশের এই ভাবময়ী বাণীমূর্তির কল্পনায় নৈবেদ্যের সৃষ্টি। স্বদেশী ভাবের বন্যায় দেশ ডুবু-ডুবু, সে যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে ? ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর দাস-মনোভাবের জগদ্দল পাথরে এই তরঙ্গের আঘাত পড়তে লাগল ভীষণভাবে। আমলাতন্ত্রের নিষ্ঠুর ও কুটিল বিধানে সোনার বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করবার হীন চেষ্টার মধ্যে এল দেশ-দেবতার প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

"বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।"

বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

"ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই
ভেদ নাই, ভেদ নাই।"

কবির পৌরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হল—

"বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি এমন শক্তিমান,
তুমি কি এমনি শক্তিমান।

* * *

শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্ব্বলেরো
হও না যতই বড় আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবিনেরে
বোঝা তোর ভারি হবে ডুব্‌বে তরী খান্।"

চারিদিকে তখন বিক্ষোভের আলোড়ন চল্‌ছে, আমাদের হৃতসর্বস্ব দেশের এই আকস্মিক বিপদে আমরা তখন নৈরাশ্য ও বেদনায় মুহ্যমান। রবীন্দ্রনাথ তখন শুনালেন আশার বাণী, মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'বার মন্ত্র। তিনি সংক্ষুব্ধা দেশ-জননীর মূর্তি দেখে বল্‌লেন—

* * *

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট নেত্র অগ্নিবরণ।"
"ওগো মা, তোমায় দেখে
আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।

মাকে চিন্‌লেন কবি—

"জননী তোমার মরণ-হরণ-বাণী—
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণ রূপে,
জননী তোমার মরণ-হরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি' ওঠে চুপে চুপে।"

—কবির প্রণাম সেদিন "সব-হারাদের মাঝে মায়ের চরণপ্রান্তে পৌঁছল না—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেই খানে যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে সবার নিচে সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি'
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে,
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে—
সবার পিছে, সবার নিচে সব-হারাদের মাঝে।"

এই সব-হারাদের, এই অপমানিতদের দুর্গতি-দুর্দশার জন্য যে আমরাই দায়ী, তাদের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য, আমাদের তাচ্ছিল্য ও অবহেলার মহাপাপ যে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে—এটা কবি অনুভব ক'রেছিলেন মর্মে মর্মে—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হোতে হ'বে তাহাদের সবার সমান।"

কবির এ ভবিষ্যৎ-বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। গণ-দেবতার জাগরণ হয়েছে দিকে দিকে, পথের বাধা আজ ছিন্নভিন্ন, উন্মথিত জন-কোলাহলের মধ্যে যে দেবতা আজ জাগ্রত, তাকে পূজা করবার প্রেরণা হয়ত জেগেছে, কিন্তু শতেক শতাব্দী ধ'রে যে পাপের ভার আমাদের মাথায় চেপে আছে তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৫০৫ থেকে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত তাঁর রচনায় আমরা দেখতে পাই, দেশ-ধর্মের উপরে তিনি ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করে—তাঁর চরণে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা পরিসমাপ্তির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন,

"তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

—যে স্বর্গে "ভয়শূন্য চিত্তে, উচ্চ শিরে, মুক্ত জ্ঞানে মানুষ চল্‌বে তার 'অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।" কিন্তু একটি প্রশ্ন তাঁকে মাঝে মাঝে ব্যথিত করেছে—সে প্রশ্নটি হচ্ছে দয়াহীন সংসারে "ক্ষমা"র প্রশ্ন :—ভগবানের দূত যুগে যুগে আসে—এসে বলে, সকলকে ভালোবাস, সকলকে ক্ষমা করো, অন্তর থেকে বিদ্বেষ-বিষ নাশ করে দাও কিন্তু—কবি বল্‌ছেন,

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,

অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে ;
তাইত তোমায় শুধাই অশ্রু জলে,—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ॥"

রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্ন শুধু কোনো একটি দেশবিশেষের প্রশ্ন নয়, এ প্রশ্ন সমগ্র সভ্য দেশের প্রশ্ন, সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সমগ্র মানব জাতির প্রশ্ন—কাজেই আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ ও মানব-প্রীতি কোনো ভৌগলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়। তাঁর দেশপ্রীতির মধ্যে কোনো প্রকার প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তাঁর দেশ তো বাঙলা নয়, ভারতবর্ষ নয়, তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে জাগ্রত ছিল এক বিরাট বিশাল পৃথিবী, সেখানে মানুষই বড়, কোনো জাতি বড় নয়, কোনো শ্রেণী বা বর্ণ বড় নয়, ধর্ম বা সমাজও বড় নয়, সেখানে একমাত্র মানুষই বড়, তাই বিশ্বমানবই কবির চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল—পুণ্যতীর্থ ভারতের, মহামানবের সাগর তীরে সকল দেশের সকল জাতির জন্য তাঁর আকুল আহ্বান—

"মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

এ আহ্বান যুদ্ধমান স্বাধীন জাতির গোপন অস্ত্র-শালার বা লোভদৃপ্ত আত্মনাশী মৃত্যু-আহবের চারিপাশে হয়ত বেসুরো শুনাবে, কিন্তু ভারতকে মহামানবের তীর্থে পরিণত করার দিকে আমরাই বা আমাদের সকলের চেষ্টাকে নিয়োজিত করতে পারলাম কৈ ?—অন্ধকারে পথ হারিয়ে যায়—হাতের প্রদীপটি যায় নিভে—স্বদেশী স্বজনের বিমুখতায় চলার পথে পিছিয়ে পড়ি, আপন জনের অতর্কিত নিষ্ঠুর আক্রমণে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাই—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস দিয়ে বলেছেন,

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
"তা' বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

* * *

আসবে পথে আঁধার নেমে
তাই বলে কি রইবি থেমে ?
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি
হয়ত বাতি জ্বল্‌বে না ;
তা' বলে ভাবনা করা চল্‌বেনা ।

সেদিন নিখিল বিশ্বে জাগল নব চেতনার নিত্য নূতন স্পন্দন, নবীন সৃষ্টির সূচনা দেখা দিল, দিন আগত ওই, কিন্তু ভারত তার অলস ঔদার্য্য, অকৃতার্থ জীবন বয়ে চল্‌বে গতানুগতিক পথে ? কবির প্রাণে তা সহ্য হ'ল না—তিনি ভাবলেন, —

"দিন আগত ওই
ভারত তবু কই
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্ব কর্ম্মভার মিলি সবার সাথে
প্রেরণ কর ভৈরব তব, দুর্জ্জয় আহ্বান হে—
জাগ্রত ভগবান হে—
জাগ্রত ভগবান ।"

নূতন যুগের সূর্য উঠল, তিমির-ঘেরা রাত্রির হ'ল অবসান, মন্দির অঙ্গনে কত যাত্রীরই না সমাগম হ'ল—কিন্তু হায়রে, ভারত ত' এলো না। কবির প্রাণ হতাশায় বেদনায় ভরে গেল, তিনি ভগবানের কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন,—ভারতের গৌরব এখন নেই, অপহৃত তার মানের আসন, সে এখন লজ্জায় নত মস্তকে দিন যাপন করছে, তাকে স্থান দাও হে ভগবান, তাকে স্থান দাও আজ সকলের মাঝে, তাকে প্রাণ দাও, তার নির্বীর্য কর্মকীর্তিহীন বাহুতে বল সঞ্চার কর। কবির সে প্রার্থনা বিফলে যায় নি। নূতন সূর্যের ভেরী বেজে উঠেছে আজ চারিদিকে, বালার্ক কিরণ পাঠায় তার আমন্ত্রণ লিপি, সে আমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করেছি। পশ্চাতে নয়—

"আগে চল আগে চল ভাই
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কি বা ফল ভাই ।"

আমরা আজ দাঁড়িয়েছি যুগ সন্ধিক্ষণে—সৃষ্টিযজ্ঞের আহ্বানে সাড়া দিতেই

হবে আমাদের সকলকে। পিছু হটে যাবার এ সময় নয়। পিছনে তাকিয়ে দেখি, অনেক পথ আমরা এগিয়ে এসেছি—দীর্ঘ পথ, সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, সংশয়ে সঙ্কটে দুর্গম সে পথ, দুর্যোগ সে রাত্রি। কিন্তু সম্মুখে নব প্রভাতের আলো ফুটে উঠছে—। সুখের প্রলোভন পিছনে ফেলে অগ্রসর হয়ে এসেছি আমরা অনেক দূর, দুঃখ বরণের অভয় মন্ত্র নিয়ে,—সে "অভয় মন্ত্র অমোঘ মন্ত্র, বিফল হবার নয়—তীরে দাঁড়িয়ে দেখি—বিক্ষুব্ধ সাগরে তরঙ্গ উঠেছে, ভয়াল ভীষণ সে তরঙ্গ। তবু জানি, দিতে হবে পাড়ি,—বন্দরে বন্দী থাকার কাল শেষ হয়ে এসেছে।

"নূতন সমুদ্র-তীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি—
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ ;

* * *

তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।

* * *

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।"

—সেই ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে আজ প্রচণ্ড আহ্বান জেগেছে—"যাত্রা কর, যাত্রা কর, ওরে যাত্রীদল"—

কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দিন
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন—

* * *

শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার—
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয় ধ্বজা তুলে !"

জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা দুঃখ বেদনার মূর্ত প্রকাশ দেখি আমরা এই শ্রেণীর রবীন্দ্র-কাব্যে। তিনি ছিলেন আমাদের মনন-চিন্তনের নেতা, সমগ্র জাতির মনন-শীলতার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর মূল কারণ দেখতে পাই আমরা—দেশের বেদনা ও ব্যর্থতা অসহায় অবনমিত জাতির গভীর বিক্ষোভ ও জ্বালার সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার মধ্যে। সাহসে, তেজে বীর্যবত্তা ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বে রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্য গগনের সদাসমুজ্জ্বল প্রখর রবি, আপনার মহিমাতে তিনি স্বয়ং প্রকাশ। উদয়গিরির সমুন্নত শিখরে তাঁর প্রথম প্রকাশ যেমন প্রতিদিনই অভিনব, অস্তগিরির গগনস্পর্শী শৃঙ্গে শৃঙ্গে তাঁর অস্তগমনও তেমনি বিস্ময়কর। অস্তমিত রবির অদর্শন সাময়িক, নিশা-শেষের উষা-সঙ্গীতে আরার তার পুনরভ্যুদয় ঘটে,—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। তবুও আপাততঃ আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান বিশেষভাবেই শোকাবহ। তাঁর মৃত্যু আকস্মিক নয়, তিনি অকালে দেহত্যাগ করেছেন একথাও বলা যায় না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবীরই ক্ষতি হয়েছে—বিশ্বমানবের ক্ষতি হয়েছে। মাত্র তের বৎসর বয়স থেকে, একাশি বৎসর পর্য্যন্ত দেশকে তিনি যে অজস্র দান দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে আমরা শোকে সান্ত্বনা পাব, একথা নিশ্চয়—কিন্তু বিশাল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অভাব আমাদের চিরকালই থেকে যাবে। আজ সমগ্র বাঙালী জাতির মুখে যাঁর ভাষা, চিন্তায় যাঁর চিন্তাধারা, স্বপ্নে যাঁর কল্পনা, কর্ম্মে যাঁর প্রেরণা, নৈরাশ্যে যাঁর সান্ত্বনা, সাধনায় যাঁর অভয় মন্ত্র, বাঙালীর জীবনে সে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারিয়েছি ; কিন্তু কী হারিয়েছি, কতখানি হারিয়েছি তার পরিমাপ করতে যাওয়া বাতুলতা। তাঁর মৃত্যুতে যে অভাবের সৃষ্টি হয়েছে সে কি কোনো ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ বাঙলা বা ভারতবর্ষের

অভাব? তাঁর অভাব যে আজ সমগ্র পৃথিবীর অভাব। আমাদের আকাশে বাতাসে তাঁর শূন্যতা, আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তাঁর শূন্যতা। কিন্তু তাঁকে যেমন হারিয়েছি তেমনি লাভও করেছি। কারণ তিনি তো সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে আসেননি যে মৃত্যুতে তাঁর সবটুকুই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আজ তিনি এক হ'তে বহুতে, ব্যক্তি হ'তে লোকে লোকে তাঁর দিব্য দেহের বিভূতি, অনশ্বর কীর্তির মহিমাকে দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন; আজ দেখছি তাঁর সমুন্নত ললাটে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের বিজয়-তিলক, নয়নে তাঁর জ্যোতির্ময় দৃষ্টির পরম প্রসাদ—আমরা কি আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে সে প্রসাদ গ্রহণ করতে পারব না?

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য, সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন?
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

স্বদেশী আমলের প্রারম্ভ থেকেই বাঙালীর স্বাদেশিক দৃষ্টিতে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালীর দেশপ্রেমের সঙ্গে জীবনের সত্যকার যোগ না থাকায় তা কতকটা ভাবোচ্ছ্বাস এবং গতানুগতিক আবেদন নিবেদনের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল; পরে, প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাতে একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, এই উন্মাদনা ক্রমে দেশকালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে আপনাকে বিশ্বের দিকে প্রসারিত করে দেয়। দ্বিজেন্দ্রলালের "ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র" গানে তার পরিচয় পাই। এই দৃষ্টির পূর্ণতম পরিণতি সাধিত হয় রবীন্দ্রনাথে—

"হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর তীরে!
* * *

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য হিন্দু-মুসলমান,
এসো এসো আজ, তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান !"

এই দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন—ভারতের নিজের মুক্তিই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, ভারতের মুক্তির উপর জগতের মুক্তি নির্ভর করছে ;— জগতের সভ্যতার, জ্ঞানের, চিন্তার এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভারতের যা দেবার আছে তার মধ্যেই নিহিত আছে ভারতের কল্যাণ, এই বোধের উপর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবোধ প্রতিষ্ঠিত, এই দর্শনসিদ্ধির পর থেকে তাঁর কাব্যে দেশাত্মবোধের বাণী বিশ্বানুভূতিতে পরিণতি লাভ করেছে।

কেও কেও এজন্য রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনুযোগ করেন—বস্তুতঃ এ অনুযোগের কোনই সার্থকতা নেই। বন্যার স্বাভাবিক পরিণতিকে প্রতিহত করে চিরদিন রাখা যায় না—রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি যে বস্তুজগৎ ও তার সঙ্কীর্ণ লাভালাভের গণ্ডী ছাড়িয়ে আপনাকে বিশ্বের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে এটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকই হয়েছে। সমস্ত জগৎ আজ রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে মুগ্ধ। এ বাণী অবশ্য ভারতের সনাতন বাণী, প্রাচীন ঋষিদের মুখেও আমরা শুনেছি—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" ; শঙ্করাচার্যও বলেছেন,

"মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিব-ভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবন ত্রয়ম্॥"

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং রবীন্দ্রোত্তর কবিদের প্রায় অনেকের রচনাতে নিবিড় দেশাত্ম-বোধের পরিচয় আছে। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "আর্য্যের মত মরিবি কে ?" দেবকুমার রায় চৌধুরীর—

"করিলি দান আমার প্রাণ আপন হৃদি রুধিরে'
আমি যে দীন সে মহাঋণ কেমনে মাগো শুধিরে।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের—

"দ্যুলোক ভূলোক পুলকি আলোকে জননী আমার রাজে
অযুত ভক্ত অমল রক্ত মরম-কমল মাঝে।"

সত্যেন্দ্র দত্তের "কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল," "গান্ধীজী", "চরকার গান", "ছেলের দল", "আমরা" এবং অতুলপ্রসাদ সেনের—

"বল' বল' বল সবে শত বীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে !"

—আজও সকলের মুখে মুখে গীত হতে শোনা যায়।

রবীন্দ্র শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী দেশাত্ম-বোধক অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছেন—তাঁর প্রসিদ্ধ 'জাগরণী' কাব্যে দেশাত্মবোধের পরিচয় পাই। 'সিংহগড়' কবিতায় শিবাজী-জননী জিজাবাই তানাজীকে ভর্ৎসনা করে বলছেন—

"দেখিস্ না চেয়ে চোখের উপরে কিবা হয় দিবা রাত
পাপ—সে হাসিয়া পুণ্যের শিরে করিতেছে পদাঘাত ;
দরিদ্র দীন মূক অসহায়,
ধনীর দুয়ারে আপনা বিকায়
দম্ভী দর্পী হেলায় ঘৃণায় হেসে করে দৃক্‌পাত—
শুধু গড় নয়, যা-কিছু তোদের গেল যে পরের হাত !"

আমাদের তথাকথিত 'ভবিষ্যৎ-আশা-ভরসাস্থল'দের সৌখীন স্বাদেশিকতা কবিকে পীড়া দিয়েছে—তাই তিনি তীব্র মর্ম-বেদনায় বিলাপ করছেন—

"হীন ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি মমত্বেরে করি বলিদান সবাকার পরে ;
ভায়েরে লাঞ্ছনা করি, জননীর সাধি অপমান রহি তাঁর ঘরে ;
বাহিরে ঢক্কার নাদে করি উচ্চরোল স্বদেশের নামে"—ইত্যাদি

এই সময়ে বাংলা কাব্যে একটা প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয়, এই প্রতি-ক্রিয়ার যুগকে আমরা "আধুনিক যুগ" নামে অভিহিত করতে পারি। এই যুগের অপরাপর অংশ আমরা অন্যান্য অধ্যায়ে আলোচনার করেছি—এখানে আমরা শুধু দেশাত্মবোধের কথাই বললাম। এই প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হয় রুশীয় গণতন্ত্রবাদ থেকে। কার্ল মার্ক্‌স্ প্রবর্তিত সমাজগোষ্ঠী নির্ণয়ের পর হঠাৎ ইউরোপের অভিজাতদের জীবন-ধারায় যে বিক্ষোভ জেগে ওঠে তাই রাশীয়ায় গণ-জাগরণরূপে আত্মপ্রকাশ করে ;—ইউরোপীয় কন্টিনেন্টাল্ সাহিত্যের অনুশীলনের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাতেও সেদিন কতকটা সেই হাওয়া এসেছিল। আমাদের দীর্ঘদিনলব্ধ সংস্কারপঙ্গু অন্তর যেমন মুটে, মজুর, কুলী, খালাসী ইতরকে সমাজে স্থান দেয়নি, আমাদের সাহিত্যও তেমনি বিলাস-লালিত রাজা রাজড়ার সুখ দুঃখ এবং উপদ্রববিহীন

মুনি ঋষির জীবন-কাহিনীকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে—আমাদের বর্ণোচিত আভিজাত্যবোধ নিরন্ন নীচ জাতিকে সাহিত্যের আসরেও অপাংক্তেয় করে রেখেছিল। এই মানবত্বের অবমাননাকর হৃদয়হীন ভেদ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন প্রতিক্রিয়ার প্রথম কবি নজরুল ইসলাম—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া
ছুঁলে তোর জাত যাবে জাত নয়ক ছেলের হাতের মোয়া"

মুটে, মজুর, তাঁতী, কৃষক, মালি এমন কি পতিতা নারী পর্যন্ত কাকেও তিনি অবজ্ঞা করেন নি—তিনি 'সাম্যবাদী'—তাঁর মতে মানুষ মানুষই, এই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথের 'সাম্য-সাম' কবিতায় মানুষের সকল শ্রেণীর সাম্য-সাধনের আভাস আমরা পাই। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিটি মার্কসবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত। যে স্বার্থবোধ, যে সংস্কার, যে সঙ্কীর্ণতা মানুষকে তার জন্মগত মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, তার প্রতিবিধানকল্পে নজরুল সমাজ, রাষ্ট্র এমন কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছেন, এজন্য তিনি "বিদ্রোহী" হয়ে বললেন…"আমি মানি নাক' কোন আইন!" কঠিন লৌহ শৃঙ্খলের ঝনৎকারেও তিনি 'মুক্তি-পথের অগ্রদূতে'র চরণ-ধ্বনি শুনেছেন, পথ দুর্গম-দুস্তর তবু তিনি হাল ছেড়ে দেন নি—

"দুর্গম গিরি-কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার!"

আশায় বুক বেঁধে তিনি গেয়েছেন—

"কবে ভেঙ্গে দুয়ার আসবে জোয়ার মরা গাঙে ডাক্‌বে বান্
ভাই ব'লে ভাই চিন্‌বি আবার গাইব' কি আর এমন গান!"

এই দুরন্ত দুঃসাহসপূর্ণ বিদ্রোহ নজরুল-পূর্ব যুগে বাংলা কাব্যে আর ছিল না বললেই হয়। শিবরাম চক্রবর্তী এবং বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। শিবরামের 'মানুষ' এবং বিজয়লালের 'সব হারাদের গান' সম্ভবতঃ অনেকেই পড়ে থাকবেন।

এই প্রতিক্রিয়ার দ্বিতীয় কবি হচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত—যতীন্দ্রনাথকে অবশ্য বয়সের দিক দিয়ে থেকে তরুণ বা আধুনিক বলা চলত না, কবি-দৃষ্টির নূতনত্বের জন্যই তিনি নবীন; তাঁর বিদ্রোহ আরও গভীর, আরও সুদূর-

প্রসারী, কতকটা intellectual ধরণের ;—'মরুমায়া'র 'বিভীষণ' কবিতায় তিনি দেশাত্মবোধের বিরুদ্ধে পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন তা প্রণিধান করবার যোগ্য! দেশ আমরা কাকে বলি? যুগযুগান্ত মানুষ কি শুধু মাটীর মোহেই এমনি করে বুকের রক্ত দিয়ে এসেছে? মাটির অন্তরালে কি কোন নিগূঢ় সত্তা আছে, মানুষ যাকে দেশ বলে ভালবাসে, অথবা দেশাত্মবোধ কি একটা নিছক idea? এ প্রশ্নের উত্তর কি?— যতীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা 'দীপ-পতঙ্গ'—

> তোদের ধূপের শ্যামধূমে ঢাকে দীপের রক্ত-প্রভা,
> তোদের মরণে শ্যাম হ'য়ে ওঠে শ্যামার রক্তজবা।
> নহে বিদ্রোহ, নহে সেত মোহ—অভিমানও নহে হায়,
> দগ্ধ দীপের দাহনইত' প্রেম গাহন করিস্ তায়।
> দীপান্বিতার দীপে দীপে জ্বালা সে নহে তোদের কাজ ;
> ওরে পতঙ্গ, দীপ্তশিখায় ঝাঁপ দিতে চল্ আজ!'

এই কবিতায় যতীন্দ্রনাথ আত্ম-উৎসর্গের মধ্যেই সত্যকার আত্ম-বিকাশের আভাস দিয়েছেন?

সমগ্র দেশের উপর দিয়ে তখন যে সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রবিপর্যয়ের প্রবল প্লাবন বয়ে গেল—সেকালীন বাঙালী কবিদের কাব্যে তার পর্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া গেল কি? ভাবপ্রবণ বাঙালী জীবনের উপর দিয়ে রাষ্ট্র-বিপ্লব এল, সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হল···কিন্তু সাহিত্যে এবং কাব্যে তার প্রকৃষ্ট ও প্রচুর অভিব্যক্তি পাওয়া গেল না।

সেই নির্যাতন, সেই উৎপীড়ন, ন্যায়, ধর্ম ও বিবেকের উপর মদক্ষিপ্ত ক্ষমতার সেই অবিরাম অনুশাসন পরাধীন দেশের কাব্যে কেন স্থান পেল না? —শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খল যে জাতির অঙ্গাভরণ হয়েছিল, সহস্র কোটি বন্ধনের নির্মম যন্ত্রণা যে জাতির প্রতিদিনকার জীবনকে বিড়ম্বিত করেছে,—আশা ছিল না, আকাঙ্খা ছিল না,—শুধু নিপীড়িত জীবনে লাঞ্ছনাই কেবল অপরিমিত হয়ে উঠেছিল, সে জাতির জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে তার সম্যক অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম কৈ? দেশের ভাগ্যদোষে জাতি-স্বাতন্ত্র্যের উপর সেদিন স্বার্থ পিশাচের পূজা-অর্চনা চলেছে—সেই মদোন্মত্ত উৎসবের বাদ্যোদমের

উতরোলে কবিদের বীণা গভীর মন্দ্রে বেজে উঠ্‌ল কৈ? বেজে উঠেছিল—নিশ্চয়ই কিন্তু সেই জাতীয় কবির সংখ্যা ছিল অল্প—তাঁদের মধ্যে প্রাণ-উচ্ছল তারুণ্য ও নবযুগের মর্মবাণী নিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন নজরুল ইসলাম।

জাতিতে মুসলিম হলেও নজরুল ছিলেন জাত্যাভিমানবর্জিত সংস্কারমুক্ত কবি—প্রচলিত ধর্ম, সমাজ বা সম্প্রদায়গত গোঁড়ামি ও পলায়নী বৃত্তির বহু ঊর্ধ্বে নজরুলের একটি সার্বজনীন সংস্কৃতি-পরিশুদ্ধ মন ছিল; সেজন্য তাঁর মনন কোনো ক্ষেত্রেই কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে তার বিস্তৃতি ও প্রশান্তি হারায়নি। তিনি মুসলিম নন, হিন্দুও নন, তিনি একটি গোটা মানুষ, তাই তিনি মানুষেরই জয়গান গাইলেন—

"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই—
নহে কিছু মহীয়ান।"

অর্থাৎ বৈষ্ণবকবির সেই "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"।—এই আন্তরিক উপলব্ধিটি আমরা নজরুলের মধ্যেও দেখিতে পেলাম।

তাই তিনি ঈশ্বরকে মন্দিরে বা মস্‌জিদে দেখেন নি, দেখেছেন সর্বমানুষের মধ্যে, আর তার মধ্যে তিনি দেখেছেন "সকল ধর্ম" "সকল যুগাবতার"।

কেও কেও দলগত সংকীর্ণ বুদ্ধিতে নজরুলকে সাম্যবাদী বা 'কমিউনিষ্ট' দলের বলে' প্রতিপন্ন করতে চান কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় মানবজাতির মধ্যে সাম্য-বোধের ইঙ্গিত আছে সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

"গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে
সব বাধা ব্যবধান।

—নজরুলের এই সাম্যের গানের সঙ্গে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ভারত তীর্থ' কবিতা পড়ি তা হলে সাম্যবাদের বা সাম্যনীতির বহু দূরে যে তাঁদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত ছিল একথা বলা যায়।

প্রাণের দরদে কবি নজরুল অজ্ঞাত, অখ্যাত, উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত জনগণের স্বরূপ দেখাবার চেষ্টা করেছেন—

"ওকে ? চণ্ডাল ? চমকাও কেন ? নহে ও ঘৃণ্য জীব।
এও হতে পারে হরিশ্চন্দ্র ওই শ্মশানের শিব।
রাখাল বলিয়া কারে কর হেলা ও হেলা কাহারে বাজে,
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে !
চাষা বলে কর ঘৃণা !
দেখ চাষারূপে লুকায়ে জনক বলরাম এল কিনা।"

অথবা—

"আসিতেছে শুভ দিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ,
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়
পাহাড় কাটা সে পথের দু'ধারে পড়িয়া যাদের হাড় !
তারাই মানুষ তারাই দেবতা নাহি তাহাদের জ্ঞান
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।-'

কবি আশাবাদী, তিনি তাই বলছেন—আর শঙ্কা নেই—

"মরিয়ার মুখে মরণের বাণী উঠিতেছে মার মার।"

* * *

"শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড় সেই হাড়ে ওঠে গান
জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব উত্থান
জয় জয় ভগবান।"

তিনি দেশের 'জোয়ানদের' বারবার আহ্বান করেছেন তাঁর বজ্রকণ্ঠে। নজরুল বিদ্রোহী, নজরুল বিপ্লবী—মনে প্রাণে দুঃখদুর্দশা, অপমান ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাঁর কাব্যের অভিযান। তাই তাঁর 'অগ্নিবীণা'য় অগ্নি-ঝঙ্কার উঠল বিদ্রোহের, বিপ্লবের—পুরাতনকে পদদলিত করে ভেঙ্গেচুরে ধ্বংস করে কবি শান্তি ও মঙ্গল আনতে চাইলেন মানুষের সমাজে—

"আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি
আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই তাই চূর্ণি।"

—কবি বলছেন, যারা তেত্রিশ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়—তাদের সর্বনাশ যেন তাঁর রক্তলেখায়—লিখিত হয়ে থাকে।

কবি সত্যই আজ রণক্লান্ত—বাহিরের পৃথিবীর কাছে আজ তিনি জীবিত থেকেও মৃত—বাহ্যজ্ঞান-হীন—। আজ কবির দেহে রণাবসানের ক্লান্তি,

মনের উপর নেমেছে—দুর্বহ জীবনের পরিশ্রান্তি। জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি থেকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত তিনি। আজ সেই বেগবান গতিতে ঝঞ্ঝা-আলোড়নের ঘূর্ণি তিরোহিত। উন্নত শির, বিদ্রোহী বীর কবি আজ শয্যা-শায়ী। তাঁর কাব্য-প্রতিভার প্রতি আজ বাঙালী মাত্রেই শ্রদ্ধাশীল।

যেহেতু নজরুল 'জনগণ'এর জয়গান করেছেন—অতএব তিনি অমুক দলের কবি এ কথা বললে নজরুলের কবি-কৃতিকে খাটো করা হয়।

কবিরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা—তাঁদের বাণী আজ সফল হতে চলেছে। ভোগায়তনের লৌহকপাটে আজ আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছেন মহাকাল—নিষ্ঠুর নিয়তির মত যে করাল, ক্ষমাশূন্য,—ন্যায়দণ্ডের সত্যকার মর্যাদা একমাত্র সেই মহাকালই রক্ষা করতে পারেন।

তাই বলে' কোনো একটি বিশিষ্ট মতবাদ বা 'ইজম্'-এর গণ্ডীতে কোনো কবিকে (অবশ্য তিনি যদি সত্যকার কবি হন) আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা সাধু-জনোচিত নয় এবং এতে করে কবির সামগ্রিক কাব্যবিচার ভ্রমাত্মক হওয়াই স্বাভাবিক।

আজ ভারত স্বাধীন হয়েও নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন। ভারতের ঐতিহ্য ও মহিমা, তার শাশ্বত সত্তা ও চিরন্তন আদর্শের কথা ভুলে আজ আমরা শুধু কি পরাশ্রয়ী পরমুখাপেক্ষী হয়ে দেশাত্মবোধের পাঠ গ্রহণ করব অন্য দেশের কাছে? আমরা কি আজ বিপুল সমাজ পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে আত্মবিস্মৃত জাতির মতো ভারতের প্রতি আমাদের সেই প্রেম ও অনুরাগ ভুলে গিয়ে বিভ্রান্তির যুগকে বরণ করে নেব? আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাগণ কেও জীবনের অপরাহ্ণে কেও বা উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আজ যাঁরা তরুণ তাঁরই এই নবলব্ধ স্বাধীনতার ধারক ও বাহক হবেন—এ সঙ্কটকালে কোনো একটি বিশিষ্ট মতবাদের স্থান কোথায়? তাই যাঁরা নজরুলকে সাম্যবাদী আখ্যা দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চান, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য নজরুলের লিখিত কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি—

> "হে তরুণ, কোন্ অঞ্জলি দিতে এই যুগে আসিয়াছ?
> কোন সে অসম্ভবের সাগর-স্রোতে তুমি ভাসিয়াছ?

> তুমি কি ঘরের ? অথবা পীড়িত ভারতের তুমি কেহ
> ভোগের অথবা পরম ভোগের তরে তব প্রাণ দেহ ?
> আজি ভারতের সন্ধিক্ষণে—অঞ্জলি নিবেদন
> করিবে কি তব সকল শক্তি আত্মা ও যৌবন ?"

আজ কয়েক বৎসর ধরে লক্ষ্য করে আসছি কবি নজরুলের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হচ্ছে তাঁকে—'বিদ্রোহী কবি' 'বিদ্রোহী কবি' বলে ঢাক পিটিয়ে। কবির এই জীবন-মৃত অবস্থা না হলে তিনি নিজেই এই অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন।

বিদ্রোহ ও বিপ্লব এক একটি যুগকে আশ্রয় করে ঘটে থাকে ; বিদ্রোহ বিপ্লবের অবসানে সেই যুগেরও অবসান ঘটে। নজরুল যে যুগে ও যে পরিপ্রেক্ষিতে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেছিলেন তার আবেদন ও রাজনৈতিক মূল্য সেকালে আমাদের অন্তর স্পর্শ করেছে—অগ্নিবীণার সে অগ্নিময় ঝঙ্কারের কথা কে বিস্মৃত হবে এবং বিদ্রোহের অবসানেও তার মর্যাদা হ্রাস পাবে এমন কথাও আমরা বলি না। কিন্তু নজরুল এই 'বিদ্রোহী' কবিতাটির জন্যই অথবা এই শ্রেণীর কবিতা রচনার জন্যই শুধু আমাদের কাছে কবিখ্যাতি লাভের অধিকারী নন। তাঁর মধুনিস্যন্দি গীতিকবিতার জন্যই তিনি তাঁর চিরদিনের জন্য কবিখ্যাতি দাবী করতে পারেন। গীতিকবিতার আবেদন চিরস্থায়ী ; সর্বকালে সর্বস্থানে সকল জাতির মধ্যে এর আকর্ষণ কোনো যুগের প্রভাবে তিরোহিত হয় না। যুগে যুগে প্রেম নরনারীকে নবজীবন আস্বাদনের সুযোগ দিয়েছে এবং যুগে যুগে প্রেমের কবিতা তার অক্ষুণ্ণ সার্থকতায় কবিকে অমর করে রেখেছে। নজরুল গীতিকবিতার কবি—একথা বিস্মৃত হলে নজরুল কাব্যের সত্য মূল্য যাচাই করতে পারা যাবে না। "সাম্যবাদের কবি" বা "বিদ্রোহের কবি" নজরুল ইসলাম কিন্তু তাঁর "শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজাফফর আহমদ সাহেবকে" তাঁর গীতি-কবিতার বই—'ছায়ানট'ই উৎসর্গ করেছেন। অতএব এটা মনে করাও অযৌক্তিক নয় যে নজরুলও নিজে তাঁর গীতিকবিতাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন বলেই তাঁর "শ্রেষ্ঠতম বন্ধু"কে সেই বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন।

এ ছাড়া—নজরুলের অজস্র গানের সঙ্গে যাঁদের সম্যক পরিচয় আছে তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন, নজরুল গীতিকবিতার কবি। সেগুলির ভাষাও যেমন সুন্দর, ভাবও তেমনি মধুর ; সুরের অনবদ্য ঝঙ্কারের সঙ্গে রস-প্রধান গীতিকবিতার সমগ্র প্রসাদগুণই সেখানে বিদ্যমান অথচ আমরা তাঁকে "বিদ্রোহী" কবি বলে, তাঁর প্রতিভা ও কবিকৃতির ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি ; তা'তে যে খ্যাতি ও সম্মানের তিনি প্রকৃত অধিকারী—তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে—এটা সত্যই আপশোষের কথা। নজরুল জাতীয় কবি —গণ-জীবনের কবি একথা অনস্বীকার্য তত্রাচ তিনি প্রধানতঃ রসেরই কবি।

নজরুলের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে একাধিক শক্তিমান লেখক বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ; তাঁদের অধিকাংশ রচনাই গীতি-কবিতা পর্যায়ের, দেশাত্মবোধক নয়। প্রেম সব দেশের সকল কাব্যেরই প্রথম ও প্রধান উপজীব্য ; প্রেম চিরন্তন, প্রেয় ও শ্রেয় বস্তু—তার অনির্বচনীয় অনভূতি মানুষকে শাশ্বত সম্পদের অধিকারী করেছে। আমাদের কবিরাও তাই পূর্বাপর প্রধানতঃ প্রেমকে আশ্রয় করেই কবিকর্ম করে এসেছেন। কিন্তু জাতি যখন সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থায় উপনীত, তখন প্রেমের স্বপ্ন তাকে বাঁচাতে পারে না। তাই দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-বেদনাকে মূর্ত করে তুলে ধরেন দেশের দরদী কবি। সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়, তাহলে তার বাস্তব রূপও তাতে প্রতিফলিত হবে। অন্যথায় ভাববিলাসিতার প্রশ্রয়ে আমাদের মন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে—কবির বীণায় বাজবে শুধু মৃদু গুঞ্জনে বসন্তরাগ—ভৈরবীর রাগিণী ঝঙ্কার আমরা তখন আর শুনতে পাব না। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি বাইরণের 'ডন্‌জুয়ান' কাব্যের কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ছে :

> "And where are they ? and where art thou
> My country, on thy voiceless shore
> The heroic lay is tuneless now—
> The heroic bosom beats no more !
> And must thy lyre, so long divine,
> Degenerate into hands like mine ?"

নজরুলেরই সমসাময়িক একজন কবি বহু দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা

করেছেন। তাঁর "রক্ত-রেখা" নামক কবিতার বইখানি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় ১৩৩১ সালের মহা অষ্টমীর দিন। দেশবন্ধু তখন সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন—"সে ভাগ্যবান, রক্তরেখা তার কপালে 'রাজটিকা' পরিয়ে দিয়েছে।" এই লেখকের দেশাত্মবোধক একাধিক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাতে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল—এখানে প্রসঙ্গতঃ সেগুলির মধ্য থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হল :—

"আজও পর্যন্ত গীতি-কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধের ধারাটি তাঁর কাব্য-সাধনায় অক্ষুণ্ণ আছে দেখতে পাওয়া যায়।"

"ব্রিটিশ শাসনের বেড়াজালে দেশে এক বিরাট কারাগারের সৃষ্টি হয়েছে —কবি তাই বলছেন—

"আপনার গৃহ যদি কারাগার
স্বদেশ বন্দীশালা,
জীবন-শিখায় বন্দিনী মার
আরতির দীপ জ্বালা।"

"যৌবনের প্রথমে বাংলার নিরন্ন অসহায় কৃষক ও কুলী এবং পল্লীবাসী দীন দরিদ্রের ব্যথায় কাতর হয়ে তিনি "পল্লীব্যথা" কাব্য রচনা করেছেন, কবি-জীবনে এই তাঁর বাণীপূজার প্রথম অর্ঘ্য। অসহায় কৃষক সারা বৎসর হাড়ভাঙা পরিশ্রমে শস্য উৎপন্ন করে, আর জুলুমদার গ্রাম্য জমিদার এসে খাজনার দায়ে তার ভিঁটেমাটি নিলাম করে নেয়; সবল দুর্বলের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়; হতভাগ্য কলের কুলি জলন্ত বয়লারের আগুনে নিজের দেহের রক্তের সঙ্গে তার মনুষ্যত্ব, ধর্ম ও নীতিবোধ, সব কিছু আহুতি দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়; অভাগিনী বালবিধবা সমাজের নিষ্ঠুর জাঁতাকলে প্রতিনিয়ত দলিত ও পৃষ্ট হয়;—এ সকলের সম্মিলিত বেদনাই কবির অন্তরকে গভীর ভাবে বিচলিত করেছে। ফুলের স্বপ্নে বিভোর কবি নিষ্ঠুর ও প্রত্যক্ষ আঘাতে জেগে উঠে বলেন,—

"আজি তুমি প্রেত-ছায়া. প্রাণহীন স্তিমিত নয়ন
কণ্ঠমালা গাঁথিবারে কর নর-কঙ্কাল চয়ন।"

তাঁর "পল্লীব্যথা" তাই দেশমাতার ব্যথারই অভিব্যক্তি।"

"বাংলার শ্মশানের মাঝে" অকাল বোধন ব্যর্থ—তাই তিনি শক্তিময়ী মহাদেবীকে উদ্দেশ করে বলছেন—"এই শ্মশানের মরাদের নিয়ে তুমি কি খেলিবে মৃত্যু-খেলা ?" না, তা' হবে না,—"তোমারে ফিরিতে হবে, পূজা তোর হবে না এবার।" তবে—

"যদি কোনওদিন ওগো মা আমার এ দীন রুদ্ধ বক্ষ টুটে
সদ্য ক্ষতের শোণিত বিন্দু অপরাজিতায় ফুটিয়া উঠে—
সেই হবে তব পূজার অর্ঘ্য, রাঙা চন্দন অশ্রু জল,
তব আগমনী সেদিন জননী, জাগাবে বক্ষে লুপ্ত বল।
সেদিন হবে মা সারা বাংলায় অকাল বোধন তোমার তরে
নীল কমলের অর্ঘ্য সাজাতে উপাড়ি' চক্ষু দিব মা ধ'রে।"

কিন্তু এখন—

"বোধনে তোমার রোদনের রোল ওঠে বাংলার বক্ষ চিরে
এর মাঝে মাগো তোমার সাধনা ? হবে না, হবে না, যাও মা ফিরে।"

"তাই তিনি দেশ-সাধকদের আহ্বান জানালেন সেই শ্মশানে—

"অত্যাচারে অবিচারে নিপীড়িত ফেলে দীর্ঘশ্বাস
শরতের নির্ম্মল বাতাস
আর্ত্তস্বরে হয়েছে মন্থর।
মথিত অন্তর
আসন্ন প্রলয় শঙ্কা করি'
প্রধূমিত চিতা পার্শ্বে কাঁপিয়া উঠিছে থরথরি।
অগ্নি-দগ্ধ এই যে শ্মশান
হে সাধক, এইখানে আজিকার দেশের আহ্বান।"

"কবি আশাবাদী, তাই বলেছেন,—

"অনন্ত দুর্য্যোগ রাত্রি—দুর্গম বন্ধুর পথ বাহি'
যারা আজ চলিয়াছে—দীপ্ত দীপ বক্ষে আগুলিয়া,
নবীন প্রভাতে তারা সাম্যের বিজয় গান গাহি'
দাঁড়াবে মন্দির তলে—পথশ্রান্তি যাইবে ভুলিয়া।"

"এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে আস্ফালন নাই, বাহ্বাস্ফোট নাই—সতেজ ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে, গভীর নিষ্ঠা ও দেশপ্রীতিতে সেগুলি উদ্দীপনাময়।"

"কবি এক স্থানে ক্ষোভে ও অভিমানে বলছেন :

"কোনখানে ওগো কোনখানে করি পূজার ঠাঁই
দর্পিত বলে মাটি কাঁপে তোমা কোথা বসাই ?

সাত কোটি প্রাণী আপনার ঘরে
মুক্তির লাগি' মাথা খুঁড়ে মরে
জন্মভূমির এতটুকু ভূমি নিজের নাই—
তীর্থ ক্ষেত্রে মেলেনা ঠাকুর-পূজার ঠাঁই।"

"একদিকে দেশের সর্বস্তরে অপরিসীম দৈন্য,—চিন্তার দৈন্য, ভাবের দৈন্য, পৌরুষের দৈন্য—নৈষ্কর্ম্যের লজ্জা, নৈরাশ্যের অবসাদ—অন্যদিকে" আইন ও শৃঙ্খলার নামে অবিচার ও অত্যাচার, শাসক ও শোষকের নির্ম্মম পীড়নে সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাস এবং দাসজীবনের পদে পদে গ্লানি ও বিড়ম্বনা—কবি তাই "দেশ-নায়ক"এর কাছে প্রার্থনা করছেন—

"গগনে পবনে বনে বনে আর দাসের মনে
শোধন-বহ্নি জ্বলিয়া উঠুক শুভক্ষণে,
মৃতের অস্থি দহন-জ্বালায়
জাগিয়া উঠুক বন্দীশালায়
বাজাও তোমার হাতের শঙ্খ গভীর স্বনে,
শ্মশানের শব উঠিয়া দাঁড়াক সঞ্জীবনে।"

* * *

"ধিকি ধিকি জ্বলে শ্মশানবহ্নি, তাল বেতাল
ডম্বরু বাজে, বাজে ঘন ঘন নর-কপাল,
এই শ্মশানের যোগাসন 'পরে
তোমারে বসাই অভিষেক ক'রে
তোমার কণ্ঠে শব-সাধনার মন্ত্রজাল
অগ্নিশিখায় দিক ছেয়ে দিকচক্রবাল।

অথবা—

"তুমি চেয়েছিলে ঝড়
উড়াইতে বিদ্রোহের বিজয়-কেতন,
ঝড়ের প্রমত্ত বেগে অগ্রগতি এ মহাজাতির,
সন্ধিক্ষণে নব জাগরণ;
আগ্নেয় সংঘাতে তুমি চেয়েছিলে যুদ্ধের ইঙ্গিত,
অস্থির সমুদ্রে তুমি
চেয়েছিলে আরও আলোড়ন,
বিস্ফোরণ চেয়েছিলে পর্ব্বতের গুহায় গুহায়।"

"স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত এই কবি আজীবন জননী জন্মভূমির মহিমাকীর্ত্তন করেছেন—দেশকে তার বিচিত্র ইতিহাস ও গৌরবময় ঐতিহ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন দেশবাসীকে *। ["পল্লীব্যথা", "আহিতাগ্নি" ও "জলন্ত তলোয়ার" সম্পর্কে সমালোচনা থেকে সংগৃহীত]

* আমাদের এই আলোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও লেখকের নাম যদি বাদ পড়ে থাকে—সে ত্রুটি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ; হয় তাঁর লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি নতুবা পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠায় তা' লুপ্ত হয়ে আছে—সাধারণ্যে তার প্রচার নেই।

সঙ্গীতে দেশাত্মবোধ

"বঙ্গভঙ্গ" ও "স্বদেশী" আন্দোলনের সময় থেকে বাংলা দেশে প্রচারিত * অজস্র জাতীয় সঙ্গীত দেখে এই কথাই মনে হয় যে—রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই, খ্যাত ও অখ্যাত এবং পল্লীবাসী বহু অজ্ঞাত লেখকের রচনা শুধু যে বাঙালীর গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দান করে তাই নয়—আন্তরিক আবেদনে সেগুলি ভাব-গম্ভীর এবং নব জাগ্রত দাস-জীবনের এক অশ্রুতপূর্ব ঐতিহাসিক মূল্যে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনে এত অজস্র সঙ্গীত রচিত হয় নি। এই সঙ্গীতের অজস্রতা জাতীয় আন্দোলনে এক নূতন উদ্দীপনার স্বষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যদি সে যুগে তাঁর কবিতা ও গানে, তাঁর প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় দেশের মনে স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা না জাগাতেন তা হলে যে শক্তি, যে নির্ভিকতা ও দেশপ্রেমের নিষ্ঠা দেশসেবকদের মৃত্যুভয়কেও তুচ্ছ করতে অনুপ্রাণিত করে ছিল—তার সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। আমাদের দেশে আজ স্বষ্টি-যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। আজ সাহিত্যিক, কথাশিল্পী ও কবিদের প্রধান কর্তব্য সেই স্বষ্টির কার্যে প্রেরণা দেওয়া, শ্রমকে মহিমাময় ও প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলা। সাহিত্য না থাকলে সমাজ বাঁচে না—দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হয় না—মনুষ্যত্বের মহিমায় জাতিকে গড়তে পারা যায় না। 'জাতীয়' সাহিত্য প্রচারধর্মী সাহিত্য, প্রেরণা ও উদ্দীপনা, আশা উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষার বাহন—কে তা অস্বীকার করবে? সম্মুখে আমাদের স্বষ্টির সাধনা, নব ভারতের নূতন সংগঠনের কঠোর সাধনা। সেই সাধনাকে সার্থক করবার পথে প্রেরণা দেবে আমাদের কাব্য, আমাদের সাহিত্য। সমাজকে বড় করবার দায়িত্ব সাহিত্যের; দেশকে বিশ্বমানবের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কাজে আমাদের সাহিত্য এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের প্রতি সাহিত্য সমুচিত মর্যাদাবোধ জাগাবে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে মহিমান্বিত করবে বর্তমান ও আগামীকালের

* বন্দেমাতরম, বন্দনা, অর্ঘ্য, স্বদেশী সঙ্গীত, মাতৃপূজা প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতের সংকলন।

সাহিত্য—তার কাব্য ও সঙ্গীত। তাতে বাঙলা সাহিত্যের নব নব অবদানে সমাজ ও জাতির নূতন করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে।

সঙ্গীতে দেশাত্মবোধ

বাংলার কাব্য যদি দেশের প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে থাকে, মুক্তি-সংগ্রামের প্রস্তুতি থেকে আয়োজন সম্পূর্ণ করার কাজে সমগ্র দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে থাকে—তাহ'লে জাতীয় সঙ্গীতও আমাদের নবজাগরণকে তরান্বিত করতে, উৎসাহ উদ্দীপনায় নির্ভীক পদক্ষেপের অবিরাম গতিকে একই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে কম সহায়তা করেনি। তা'ছাড়া সঙ্গীত তো কাব্যকে আশ্রয় করেই পত্র পুষ্পে বিকশিত হয়ে ওঠে। তার রচনার যে সৌন্দর্য সেতো কাব্যেরই সৌন্দর্য,—তার রস, তার সুরের যে মাধুর্য সেও কাব্যের প্রাণ-ধারা থেকে আহৃত। কাব্যের অলঙ্করণ থেকে সুরু ক'রে তার বিন্যাস-কৌশল, তার আঙ্গিক, তার ছন্দ প্রভৃতি সবই অল্পাধিক সঙ্গীতে ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান—শুধু ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে সঙ্গীত একটি সীমিত বা সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে—কিন্তু সামগ্রিক ভাবে প্রত্যেক সঙ্গীতই এক একটি ক্ষুদ্র কবিতা।

সেজন্য শুধু জাতীয় জীবনের প্রয়োজন ও সার্থকতার দিক থেকে নয়—কাব্যিক মূল্যের দিক থেকেও বর্তমান প্রসঙ্গে সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্তি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

আমরা আমাদের বক্তব্যকে বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য শুধু বাংলা দেশে নয়—বিভিন্ন প্রদেশে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে, জাতীয় সঙ্গীতের উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছি।

বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত, এশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রাচীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ধারা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই যে জাতীয় জাগরণকে উপলক্ষ্য করে বাংলা দেশে যেরূপ অজস্র জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছে—তার তুলনা অন্য কোথাও নেই। সত্যই সেদিন বাংলায় মরা গাঙে বান এসেছিল—তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহে বাঙালী অবগাহন স্নান করে ধন্য হয়েছে, তীর্থস্নানের মহাপুণ্যে বাঙালীর জীবন সেদিন পবিত্র হয়েছে, নির্মল হয়েছে।

আজ স্বাধীন দেশে আমাদের জাতীয় জীবনের সেই ঐতিহ্যময় পটভূমি বিলুপ্ত-প্রায় কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি এক গৌরবময় অধ্যায়—বাংলা দেশের কাব্য-সাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ—সে সম্পদ যথাসম্ভব আহৃত হয়েছে বর্তমান লেখকের "বন্দনা" নামক সঙ্কলন পুস্তকে। যাহোক প্রসঙ্গতঃ এ কথার উল্লেখ করা হলেও আজ কাব্য ক্ষেত্রের "নবপ্রচেষ্টা"র মোহে আমরা যদি আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের সেই মহিমাময় ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হই, তাহলে বাংলা কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক চিরদিনের জন্যই উপেক্ষিত হয়ে থাকবে। সেজন্য 'সঙ্গীতে দেশাত্মবোধ'কে এই অধ্যায়ে তার যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হল।

জাতীয় সঙ্গীতের উৎস

দেশের সব চাইতে যখন দুর্দিন—আশা নেই, উৎসাহ নেই, উন্মাদনা নেই, চারিদিক অন্ধকার ক'রে এসেছে, দেহমন অবসন্ন,—তখন আমরা এমন গান শুনতে চাই, যে গানে আধমরা মানুষ বেঁচে ওঠে, চোখের সামনে নূতন আলোক দেখে এগিয়ে চ'লে যেতে পারি দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে। আবার যখন অধঃপতিত অবনমিত, পদে পদে লাঞ্ছিত মানুষ আপনার স্বরূপ বুঝতে পেরে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়, তার দেশকে ও জাতিকে চিনে নিয়ে তার মর্যাদা রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, তখনও তারা এমন গান শুনতে চায়, যে গানে অন্তরের পরিপূর্ণ আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তখন মানুষ সব কিছুকে তুচ্ছ ক'রে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বাইরে এসে দাঁড়ায়। যে গানে রুদ্ধ কারাগারের দ্বার আপনা হ'তেই খুলে যায়, দাস জাতির হাতের শৃঙ্খল খসে পড়ে আনন্দের ঝন্‌ঝনায়, যে গানে নিজের জন্মগত অধিকারের জোরে মানুষ মুক্তি পায়,—সে গান আমরা যুগে যুগে শুনেছি দেশ ও জাতির অপরিসীম দুর্গতির মধ্যে অথবা তার নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার পর যে বিপ্লবের ঝড় আসে, বন্যা আসে তারই মধ্যে। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, স্পেনে, জার্ম্মাণীতে, ইটালীতে, চীনে, আমেরিকাতে, রাশিয়াতে সে গান জাতিকে অভ্যুদয়ের পথে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছে। তেমনি ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ এই বাঙলা দেশে তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুলিশি জুলুমের ভয় দেখিয়ে তখন আমাদের "স্বদেশী গান" এর কণ্ঠরোধ করতে পারা যায় নি।

তখনকার দিনের স্বদেশী গানের বই "বন্দনা" ও "বন্দে মাতরম্" বাজেয়াপ্ত হয়েছে, গান গাইতে গিয়ে পুলিশের লাঠি খেতে হয়েছে, বে-আইনি বলে গায়কের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে রাজদ্রোহমূলক প্রচারকার্যের অপরাধে। এই প্রসঙ্গে তাই একটি গানের কয়েকটি কথা মনে পড়ে,—মুকুন্দদাসের যাত্রায় সেটি শুনেছিলাম—

"আমি গান গাহিতাম
গাইতে দিলে গান
সে গানে মাতিয়ে দিতাম প্রাণ।"

* * *

"শুকো রবি কিরণ ছড়াত
ঘুমের মানুষ জেগে উঠিত
পাগলটা একাই পারিত
বিশ্ব ধরে দিতে একটি টান।"

গানটি এখনো আমাদের কানে লেগে আছে; আর মনে পড়ে কামিনী কুমার ভট্টাচার্যের আর একটি গানের প্রথম চরণটি

"শাসন-সংযত কণ্ঠ জননী
গাহিতে পারি না গান,
তাই, মরম-বেদনা লুকাই মরমে
আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ।"

যা হোক এদেশের "স্বদেশী" বা জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

স্পেনে প্রজাতন্ত্রের উদ্বোধন হোল যে গানে তার নাম "The Fourteenth April"; ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত "La Marsellaise" (লা মার্সাই)। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে দেড় হাজার লোক লাল টুপি পরে' মার্সাই থেকে প্যারি সহরের দিকে "মার্চ" করে চলেছিল এই গান গেয়ে—

Rise up ye children of our fatherland
Days of glories now behold,
See the blood-stained flag of oppression
Yet again the tyrants uphold.
Do you not see like raging water
Fierce soldiers are gathering round ?
They come to seize like ruthless hounds
And to slay your sons and daughters.
To arms, Comrades !
Forward, Citizens !
March on, march on
Till their vile blood be flowing over the land.

অর্থাৎ—"জাগো আমাদের পিতৃভূমির সন্তানগণ, গৌরবময় দিনের দিকে চেয়ে দেখ, ঐ উৎপীড়নের নিশানে রক্তের চিহ্ন ; তবু অত্যাচারীরা আজও প্রবল। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে বন্যার মত ধেয়ে আসছে ভয়ঙ্কর সৈনিকের দল ? তারা আস্‌ছে নৃশংস শিকারী কুকুরের মত আক্রমণ করতে,—তোমাদের পুত্র-কন্যাদের হত্যা করতে। বন্ধুগণ, হাতিয়ার নাও,—পুরবাসী এগিয়ে চল,—এগিয়ে চল, যতক্ষণ না তাদের ঘৃণিত রক্তে সমস্ত দেশ প্লাবিত হয়ে যায়।"

এই গানটির রচনাকাল হচ্ছে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ এবং এর লেখক হচ্ছেন Rouget de Lille (রগেট ডি লিলে)। আমেরিকার "Star-spangled Banner", "America", "Hail Columbia" প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতের কথাও সকলে জানেন। এই গানগুলির মধ্যে প্রথম দু'টিরই প্রচলন বেশী।

ইংলণ্ডের "God save the King", "Rule Britania"—জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তার মধ্যে তেমন উন্মাদনা বা কোনও আকর্ষণ নেই। স্বাধীন জাতির জাতীয় সঙ্গীত ব'লে তার মর্যাদা আছে বটে, কিন্তু গায়ক বা শ্রোতার অন্তরকে অভিভূত করে' দেবার মত গুণ এগুলিতে আছে বলে মনে করি না ; ভাবও খুব মামুলি। ইটালীর 'Mercia Reale' অর্থাৎ Royal March একদা Fascist Hymn-এ

পরিণতি লাভ করেছিল। Glovinezza গানটির মধ্যে মুসোলিনীর নামের উল্লেখ আছে। ঐ গানের একটি চরণে আছে—

"The Italians within the boundaries have been made and it is Mussolini who has remade them for the war of to-morrow."

অর্থাৎ "ইটালীর অধিবাসিবৃন্দের নবজন্ম হয়েচে তাদের দেশের সীমানার মধ্যে এবং মুসোলিনীই আগামীকালের যুদ্ধের জন্য তাদের নূতন করে তৈরি করেছেন।"

জার্মান প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত বলতে আমরা বুঝি "Hell Dir im Siegerkranz" অর্থাৎ Hail to the Victor's Laurels এবং "Deutschland Fiban Alces."

রাশিয়ার কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের জাতীয় সঙ্গীত "Internationale" গানটি ফরাসী কবি পটিয়ের (Pottier) ফরাসী ভাষায় লেখেন এবং প্যারিসে 'ফ্রেঞ্চ কমিউন'এ সর্বপ্রথম গীত হয়। তারপর এই গানটি রাশিয়ার কমিউনিষ্টদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে অন্যান্য দেশেও বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছে,—

"Arise prisoners of starvation,
Arise ye wretched of the earth,
For justice thunders condemnation
And a new world is in birth.

Then away with all your superstitions,
Servile masses arise, arise.
We'll change forthwith old conditions
And spurn the dust to win the prize.
Then comrades come rally
And the last fight let us face,
The Internationale
Unites the human race."

(Pottier, 1871)

অর্থাৎ—"অনশনে বন্দীর দল তোমরা জাগো, জাগো বিশ্বের অবজ্ঞাত দুর্গতের দল; কারণ বিচারের সুতীব্র নিন্দার বজ্রনির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে; নূতন পৃথিবীর জন্ম আসন্নপ্রায়। কুসংস্কার দূরে ঠেলে ফেল—জাগো, জাগো অবনত জনগণ, বদলে দেব আমরা পুরাতন ব্যবস্থা—

পথের ধূলি বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়বে আমাদের পশ্চাতে, এগিয়ে চলব আমরা সাফল্য লাভের জন্য ; এস এস, বন্ধুগণ, জমায়েৎ হও, শেষ যুদ্ধের সম্মুখীন হতেই হবে আমাদের। সমগ্র মনুষ্যজাতিকে সম্মিলিত ক'রে আমাদের এই জাতীয় সঙ্গীত—"ইন্‌টারন্যাশনেল"।

আর একটি সুন্দর গান আছে—"সোভিয়েট"। ষ্টেটের এই গানখানি অবশ্য "ইন্‌টারন্যাশনেল"-এর মত উৎপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির জন্য আত্মবোধ জাগ্রত করবার আহ্বান নয়—আশু সংগ্রাম ঘোষণা বা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশও নয়—এ গানখানি জয়যুক্ত জনগণের গৌরব, উদ্দীপনা ও আনন্দের গান। এটি সোভিয়েট ষ্টেটের উৎসব বা বৃহৎ অনুষ্ঠানে গীত হয়ে থাকে।—এর নাম দেওয়া হয়েছে—"Soviet National Anthem"– সোভিয়েট জাতীয় সঙ্গীত।—গানটি হচ্ছে এই,—

"Unbreakable union of freedom republics,
Great Russia has welded forever to stand.
Created in struggle by will of the peoples,
United and mighty, our Soviet land !

Sing to our Motherland, glory undying
Bulwark of peoples in brotherhood strong !
Flag of the Soviets, peoples flag flying,
Lead us from victory to victory on !

Our army grew up in the heart of the grim battle.
Barbarian invaders we'll swiftly strike down,
In combat the fate of future we settle,
Our country we'll lead to eternal renown."

অর্থাৎ—স্বাধীন গণতন্ত্রে এ ঐক্য কখনো ভাঙবে না। মহান রাশিয়া গড়ে উঠেছে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে ব'লে। জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তিতে সংগ্রামের মধ্যেই এ দেশের স্বষ্টি হয়েছে, সম্মিলিত, শক্তিশালী আমাদের এই সোভিয়েট দেশ। ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়তায়, বহু প্রদেশের বহু জনের প্রতিরোধ-পরিখার মধ্যে জন্মভূমিকে শুনাও তার অক্ষুণ্ণ গৌরবের গান। সোভিয়েটের পতাকা, সম্মিলিত জনগণের পতাকা উড়ছে ; আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে অবিরাম জয়ের পথে। ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে গড়ে উঠেছে আমাদের সৈন্যবাহিনী। বর্বর আক্রমণ-

কারীদের আমরা ত্বরিৎগতিতে আঘাত করবো। সংগ্রামের মধ্যে ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করি আমরাই, আমাদের দেশকে আমরা অগ্রসর করে নিয়ে যাব তার চিরন্তন খ্যাতির দিকে।

নবীন ফ্রান্সের সমর-সঙ্গীত

সাজ্জাদ জাহীর একজন নামজাদা লেখক—নানা দেশের সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁর বিশেষ দখল আছে। কিছুকাল আগে তিনি একখানি পত্রিকায় নবীন ফ্রান্সের সমর-সঙ্গীত সম্বন্ধে মূল ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ করে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ফ্রান্সের আর এক দিকের কাব্যজগতে আলোকপাত করবে আশা করি। লেখক বলেছেন—"No one who saw France during defeat—and afterwards under the German yoke—can be surprised at the renaissance of lyric poetry in France today. Lyric verse in its most poignant form has ever been a child of sorrow. Only the lyric poet can adequately express periods of moral crisis, suffering and trial—whether individual or collective. 'Of my deep sorrows, I make little songs'—wrote Heine. The "little songs" of France today gives us the heart-beat of a nation.

অর্থাৎ ফ্রান্সকে যিনি পরাজয়ের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে জারম্যান শাসনের অধীনে দেখেছেন তিনি আজকের দিনের ফ্রান্সের এই গাতি-কাব্যের নব অভ্যুদয় দেখে বিস্মিত হবেন না; দুঃখ থেকেই এই সুতীব্র গীতিকবিতাগুলির জন্ম। দেশের নৈতিক সঙ্কট, নির্যাতন-ভোগ ও পরীক্ষার কালকে সুস্পষ্ট ও সম্যক্ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন একমাত্র গীতি-কবিতার কবিরা—সে দুঃখ ব্যক্তিগত জীবনের গভীর দুঃখই হোক, আর সমগ্র জাতির সমষ্টিগত দুঃখই হোক। আজকের দিনের সমর-গীতির মধ্যে সমগ্র ফ্রান্সের অন্তর স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌ছে।

এই "Little songs" সম্পর্কে বল্‌তে গিয়ে ফরাসী লেখক বলছেন—

"মনে পড়ে আমার ১৯৪০ এর ভয়াবহ দিনে ফরাসীদের ব্যথাতুর মুখগুলি, মনে পড়ে আমার সেদিনের সেই দুঃস্বপ্নময় বিচ্ছিন্নতা,—মনে পড়ে অবিশ্বাস্য পরাজয়ের পর স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন সমগ্র ফরাসী দেশের কথা।"

"শোকে মুহ্যমান হয়ে এমনি স্তব্ধতার মধ্যেই মানুষ পিছন ফিরে চায়; যা গেল তার মূল্য যাচাই করার জন্য—যে বিশ্বাস নিয়ে সে বেঁচে থাকবে আগামীকাল, তাই হাতড়ে বেড়ায় সে এমনি স্তব্ধতার মধ্যে। মনে পড়ে বিদ্রোহের ঢেউ উঠল পাহাড় প্রমাণ, আর তারি সঙ্গে জন্ম হোল নূতন বিশ্বাসের।"

শত সহস্র মূক ফরাসী জনসাধারণের অন্তরের কথা ফুটে উঠল কবির কাব্যে। সেই কাব্যে মুখর হয়ে উঠল জনগণের ব্যথা, তাদের বিদ্রোহী মনের বিক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্খা। এই কবিদের মধ্যে অনেকেই ফরাসী কাব্যজগতে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত ছিলেন—তাঁদের সঙ্গে উদ্ভব হল বহু নবীন কবির। প্রথম কবিদের মধ্যে অনেকেই নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন, যেমন Jules Superviele—দূর থেকে তিনি ফ্রান্সের জন্য আকুল হয়ে উঠলেন :

"I seek for France from far away
With empty hands,
I seek in empty space
And at great distance..."

—বহুদূর থেকে আজ খুঁজি ফ্রান্সকে শূন্য হাতে, শূন্য আবাসে—অনেক দূর থেকে।অথবা—"O Paris, open city like a wound..."
—প্যারি, উন্মুক্ত নগরী, ক্ষতের মত।

অবরুদ্ধ ফ্রান্সে ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রতিরোধের কণ্ঠ। এ্যালজিয়ার্স (Algiers) থেকে প্রাকাশিত Fontain কাগজে এই সব লেখকেরা শত্রুর সঙ্গে সর্ব প্রকার সহযোগের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করবার আশ্রয় খুঁজে পেলেন। এঁদের লেখায় বিদ্রোহের অগ্নি আছে, আশার বাণী আছে, আর অকুণ্ঠ বিশ্বাসের পরিচয় আছে ফ্রান্সের ভাবী সৌভাগ্যের উপর। কবিদের এই গীতিমালিকার ফুলগুলি বহু বর্ণে রঞ্জিত! বিপুল

জনসংঘের সঙ্গে কবির কণ্ঠ একই ঝঙ্কারে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—একের কণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে বহুর অন্তরের কথায়—

"And my entire being yearns passionately for liberty ;
For liberty, dragged to earth and murdered..."
(Loys Masson)

—আমার সমগ্র দেহমনে আজ সুতীব্র ব্যাকুলতা স্বাধীনতার জন্য—
যে স্বাধীনতাকে মাটিতে টেনে নামিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

অথবা—

"There is not one almond tree this spring
whose trunk is not caught in a chain.
Fetters of a slave, touching the soil,
from where rovolt arise,"

* * *

"এ বসন্তে এমন একটি অ্যালমণ্ড গাছ নেই—যার কাণ্ড শৃঙ্খলে পড়েনি বাঁধা ; পরাধীন মানুষের বন্ধন-শৃঙ্খল মাটি স্পর্শ করে লুটাচ্ছে—যে মাটি থেকে জেগে ওঠে বিদ্রোহ। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই গাছ—ফুল ফুটাচ্ছে গানের—নরদেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত রক্তের এ গান ; তার শাখা-প্রশাখা নুয়ে প'ড়ে ব্যাষ্টাইলের অবরুদ্ধ দ্বারের উপর তোরণ রচনা করছে। আজকের দিনে এমন চেষ্টনাট গাছ একটিও নেই যা' অনুভব করছে না যে তার ফলগুলি কঠিন হয়ে যাচ্ছে বন্দুকের গুলির মত—যে গুলিতে তারই ছায়ায় নিহত হয়েছে কত অজানা মানুষ। এমন বাগান আজ নেই এখানে, যা মৃত মহাত্মাদের উপর ছড়িয়ে দেয়নি তার শুভ্র আস্তরণ ; প্রতিহিংসার দুর্দমনী ক্রোধে ও বিক্ষোভে সমুদ্রের উপর দিয়ে আজ এমন একটি পাখিও উড়ে যায় না, যার কাকলিতে মুক্তি পাবার জন্য ক্রন্দন শোনা যায় না। এ বসন্তে যে গাইবে গান, সে ন্যায়-বিধানের গান না গেয়ে আজ আর অন্য কোন্ গান গাইবে ? বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি-তরঙ্গে বিদ্রোহের ফেনায়িত ঢেউয়ের পর ঢেউ না তুলে, কোন যন্ত্রী আজ বাজাবে তার যন্ত্র ?"

Gabriel Auidiio—আর একজন বিদ্রোহী কবি, তাঁর ঘোষণা আরো তীব্র—আরো ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচায়ক ঃ

"The living have some motives of their own,
The dead have their secrets to keep.
Those that are invisible shall come
On smouldering ashes where marching quietly
They shall leave their foot-prints."

—"জীবিতদের আছে আপন আপন উদ্দেশ্য,—মৃতের কাছে রয়ে গেল অনেক কিছু গুপ্ত,—যারা অদৃশ্য তারা আসবেই, ধূমায়িত ভস্ম-স্তূপের উপর ধীরে ধীরে পা ফেলে তারা আস্‌বে—তাদের পায়ের চিহ্ন থাকবে অক্ষয় হয়ে সেই ভস্মের উপর।"

পুরাতন লেখকদের মধ্যে সমর-কবি হিসাবে সব চাইতে বড় Louis Aragon—এঁর কবিতা ও গান কড়া পাহারার প্রাচীর ভেদ করে বাইরের জগতে এসে পৌঁচেছিল। Armistice অর্থাৎ যুদ্ধ-বিরতির পর তাঁর দু'খানা বই বেরিয়েছিল। Creve Cocur—ফ্রান্সে প্রকাশিত হতে না হতেই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু পুনরায় প্রকাশিত হয় গ্রেট ব্রিটেনে;—Les Yeux d'Elsa,—মুদ্রিত হয়েছিল সুইটজারল্যাণ্ডে এবং তখন শোনা গিয়েছিল সেখানি শীঘ্রই লণ্ডনে প্রকাশিত হবে।

Aragonএর কবিতাগুলির ধাঁজ ও ভাব সেকালের ফরাসী গীতিকবিতার মতো, ফরাসী ভাবুকতা ও অনুভূতির স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর রচনার উপর। সাধারণ লোকেদের যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে প্রস্তুত রাখলে তাদের মনে যে তিক্ততা ও বিক্ষোভ দেখতে পাওয়া যায়, পৃথিবীব্যাপী আসন্ন আর একটি মহাযুদ্ধে আর একবার পৃথিবীর তরুণ প্রাণের নিষ্ঠুর উৎসর্গ হবে এই আশঙ্কায়—মনের বিক্ষোভ ফুটে উঠেছে Aragonএর রচনাতে :

"The night of the Medieval Age
Covers with a dark mantle this broken universe."

"মধ্যযুগের রাত্রি, তিমিরাবরণ দিয়ে ঢেকে ফেলেছে এই শতধা ভগ্ন পৃথিবীকে।"

সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে—ব্যক্তিগত নিরানন্দের মধ্যে Aragon একমাত্র চিরন্তন বস্তু দেখতে পাচ্ছেন—তাঁর পত্নীর প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা; অন্ধকারের মধ্যে সেই ভালবাসাই তাঁর একমাত্র আলোক-বর্তিকা;

"Oh my love, oh my love, you only exist
At this hour of sad sunset for me,
When I seem to lose all at once
the thread of my poetry
Of my wife and of joy........."

—"হে আমার প্রেম, আমার ভাগ্যে তুমিই একমাত্র আছ আমার সূর্যাস্তের দুঃখময় মুহূর্তে—যখন মনে হয় আমি আমার সব কিছু হারাতে বসেছি—আমার কাব্যের ও আমার প্রিয়তমার সঙ্গে, আমার জীবনের আনন্দের সঙ্গে আমার সকল যোগসূত্রকে, তখন শুধু তুমিই আছো।"

তারপর এল পশ্চাৎ অপসরণের পালা কয়লার দেশ দিয়ে, যে দেশে আছে ক্রোধ, আছে কয়লার তিক্ত আস্বাদ। সেখান দিয়ে যারা পালিয়ে যাচ্ছে—তাদের প্রতি বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে—

"A handkerchief of fire rays ; Adieu."

—তারপর এল armistic অর্থাৎ যুদ্ধ-বিরতি :

"My country is like a boat
Whose sailors have abandoned it,
And I am like the king,
More unhappy than unhappiness,
Who remains the king of his sorrows.
To live now is no more than a strategy,
Even the breeze can hardly dry tears,
It is necessary to hate all that I love.
I have no more to give
The enslaver now rules...

—"আমার দেশ যেন একখানি নৌকা—তার মাঝিরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে ; আমি যেন সেই রাজা, যার দুঃখ—দুঃখের চেয়েও গভীরতর, সে বেঁচে থাকে দুঃখেরই রাজা হয়ে ; বেঁচে থাকা এখন রণ-কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। বাতাসেও শুকায় না চোখের জল ! সকল ভালবাসার বস্তুকেই এখন করতে হ'বে ঘৃণা। আমার দিবার মত আর কিছু নেই, যে আমাদের দাস বানিয়েছে সেই করে আজ রাজত্ব।"

কবি অতীতকে স্মরণ করেছেন—পরাজয়ের তামসী রাত্রির কল্পনা করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের নূতন প্রভাতের আগমনীও শুনিয়েছেন।

তারপর থেকে দেশের দুর্গতি তাঁর মনকে সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন করে

ফেলেছে, ব্যক্তিগত আনন্দ ও সম্ভোগের মধ্যে আর কোনও দিন নিজেকে তিনি নিমগ্ন করতে পারেন নি—

"My love, I was in your arms.
Outside, someone was humming
An old French song.
At last I now understand what is wrong with me—
Its refrain wag like a naked foot,
Stirring the green waters of silence."

—"প্রিয়তমে, আমি ছিলাম তোমার বাহুপাশে ; বাইরে কে গুন্ গুন্ করে গাইছিল একটি পুরাতন ফরাসী গান। অবশেষে এখন আমি বুঝতে পারছি আমার হয়েছে কি ; সে গানের অন্তরাটি যেন নগ্ন পদে—নিস্তব্ধতার নীল জলে জাগিয়ে তুলছে চঞ্চলতা।"

ব্যক্তিগত ভালবাসা ক্রমশঃ মিশে যায় দেশপ্রীতিতে, কবির পত্নীপ্রেম মহত্তর প্রেমের মধ্যে গভীর হয়ে ওঠে। প্রেম দুই ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলে— একাঙ্গ হয়ে। কবি জাতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে যান—

"I too have secrets, like half-mast flags
They can question me endlessly
and ask who am I, what was I.
I remember only the sky, only one
and only one queen ;
Howsoever poor she may be,
I shall be only her trail-bearer
The only azure for me is my loyalty.

* * *

No one can take away from us
the song of the flute."

—"আমারও আছে রহস্য—"অর্ধ-অবনত পতাকারা আমাকে অনন্ত প্রশ্ন করে যাবে—কে আমি, কি ছিলাম আমি। আমার মনে পড়ে একমাত্র একটি আকাশকে, মাত্র একজন রাণীকেই। আমার অনুরাগেই আকাশ নীলাভ। হোক না সে যতই দরিদ্র, তবু আমি শুধু তারই অঞ্চল-বাহী হয়ে থাক্‌ব—বাঁশীর গান কেড়ে নিতে পারে না কেউ আমাদের কাছ থেকে"—

"Which rises century after century from our throats,
The laurels are cut but there are other struggles
Which shall grow with our sweet marjorams and
our rose.trees...

It does not matter if die before
The emergence of the sacred face which will
certainly again appear one day.
Let us dance O my friend ! let us dance the capucine
My fatherland is hunger, misery and love."

—"শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে গান উঠ্ছে আমাদের কণ্ঠ থেকে ; আজ আমাদের জয়মাল্য ছিন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু আরও আছে সংগ্রাম, যে সংগ্রাম বেড়ে চলবে আমাদের সুগন্ধ গোলাপ ও মারজোরাম গাছের সঙ্গে। কি এসে যায় যদি পবিত্র মুখখানির আবির্ভাবের পূর্বেই হয় তার মৃত্যু ? একদিন নিশ্চয় হবে তার আবির্ভাব। নাচো বন্ধুগণ নাচো, ক্ষুধা, দুর্গতি ও প্রীতি—এই নিয়েই ত আমার দেশ !"

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, ফরাসী কবিতা ও গান তার পবিত্রতম ঐতিহ্যে ফিরে এসেছিল, নবতন প্রেরণায় হয়ে উঠেছিল সঞ্জীবিত ফরাসী কবিদের গানে গানে,—যে গানে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল জাতীয় জীবনের মহা নাটক। ফ্রান্স সমগ্র জগতের কাছে সেদিন আত্মপ্রকাশ করে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার ভেদ করে আবার নূতন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে বেরিয়ে এসেছিল ফ্রান্স—বৃহত্তর ফ্রান্স, যার অনমনীয় আত্মা একদা প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছিল তার নিদারুণ দুঃখের দিনে।

এশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত

স্বাধীনতার জন্য ভারতের প্রতিবেশী "ইন্দোনেশিয়া"র অবিরাম সংগ্রামের কথা আজ আমাদের অজ্ঞাত নেই,—এই সেদিনও তারা ওলন্দাজ সরকারের শাসনশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, এশিয়াবাসীর পক্ষে সেটা বিশেষ গর্বের কথা। নিম্নে আমরা তাদের জাতীয় সঙ্গীত "মেরদিকা" (Merdika) অর্থাৎ "স্বাধীনতা"র ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করলাম—

There stands my country, Indonesia
Where I was born,
On the soil of which I stand erect today.
There stands my country, Indonesia !

I shall look after my organisation
just as I do for my mother.
There stands Indonesia—where my
countrymen are living.
I love my countrymen,
There stands my country, Indonesia !

Come on, and let us enjoy,
Unite, all Indonesians,
Pray God, my country be beautiful
and big.
There stands my country, Indonesia !

Long live my country !
My conntry, my people, my body,
Rise up in action !
Indonesia ! Get up, be ready !
There stands my country, Indonesia !

Get up the soul of Indonesia,
Awake for Indonesian glory,
Oh ! Happy and prosperous Indonesia !
There stands my country, Indonesia !

I love my motherland,
Get up glorious Indonesia !
To Indonesia, Freedom and Prosperity,
There stands my country Indonesia !

—"এই তো আমার দেশ, ইন্দোনেশিয়া !
এইখানেই আমার জন্ম,
যার মাটির উপর আজ আমি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছি,
সেই তো আমার দেশ, ইন্দোনেশিয়া।

মায়ের যত্ন যেমন আমি নিই—তেমনি যত্ন নেব আমার সংঘের—
এই আমার ইন্দোনেশিয়া যেখানে বাস করে আমার দেশবাসী,
ভালবাসি আমি আমার দেশবাসীকে,
এইত আমার দেশ, ইন্দোনেশিয়া।
এস এস আমরা সকলে এক হই, আনন্দ করি,
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

আমার দেশ সুন্দর হোক—বৃহৎ হোক।
এই তো আমার দেশ, ইন্দোনেশিয়া।

দীর্ঘায়ু হোক আমার দেশ!
আমার দেশ, আমার জাতি,
আমার দেহ ও কর্মে জাগ্রত হও!
ইন্দোনেশিয়া! ওঠ, প্রস্তুত হও।
এই তো আমার দেশ, ইন্দোনেশিয়া।

ওঠ, ইন্দোনেশিয়ার আত্মা,
জাগো ইন্দোনেশিয়ার গৌরবের জন্য,
আহা! সুখী, সম্পৎশালী ইন্দোনেশিয়া!
এই তো আমার দেশ, ইন্দোনেশিয়া।

মাতৃভূমিকে আমি ভালবাসি,
ওঠ গৌরবান্বিত ইন্দোনেশিয়া,
মুক্তি ও সমৃদ্ধি হোক ইন্দোনেশিয়ার।
এই তো আমার দেশ, ইন্দোনেশিয়া।"

ইন্দোনেশিয়ার আর একটি জাতীয় সঙ্গীত ঃ—

"এক অবিশ্রান্ত লড়াইয়ের ময়দান এই জীবন
আমার তোমার মতো মানুষই সৈনিক এখানে।
সহস্র বিপদেও পরাজয় মানবে না,
শক্ত ক'রে আগলিয়ে থাকবে ঘাঁটি, তবেই তোমার গৌরব।
ঝাণ্ডা তোমার চিরদিন উড়ুক উঁচুতে,
তারা-ছোঁওয়া আমাদের আদর্শ যে।
হাসিমুখে মেনে নিতে শেখো দুর্ভাগ্যকে,
সংগ্রামের দুঃখ বিনা জয় কি পূর্ণ হয়?
বাতাসের মুখে পাল তুলে ধর,
উত্তাল ঝড়ো ঢেউয়ে থাকো নির্ভীক।
বাধামুক্ত ডানা মেলে শূন্যে নিজেকে ভাসিয়ে দাও,
আকাশের অসীমতার মাঝে খুঁজে পাবে
তোমার ছোট্ট পৃথিবীকে।"

চীন-দেশীয় জাতীয় সঙ্গীতের (Chinese Liberty Song) অংশ বিশেষের ইংরাজি অনুবাদ উদ্ধৃত করছি ঃ—

"When the sun rises I toil ;
When the sun sets I rest ;
I dig wells for water ;
I till fields for food ;
What has the Emperor's power
to do with me ?"

—"সূর্য উঠ্‌লে আমি খাটতে সুরু করি ; সূর্য অস্ত গেলে আমি করি বিশ্রাম ; জলের জন্য আমি খনন করি কূপ ; খাদ্যের জন্য কর্ষণ করি ভূমি, সম্রাটের শক্তির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?"

চীনাদের এই জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দেশপ্রীতি অপেক্ষা ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব ক্ষমতা ও আত্মসম্মানের উপর সুদৃঢ় নির্ভরতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

প্রাচীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের কথা আজ লুপ্ত হয়ে আছে। ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণে বহুবার পরাস্ত হয়েছে একথা সত্য কিন্তু শক, হুন, পাঠান, মোগল তাদের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসেও সহজে এদেশে অধিকার বিস্তার করতে পারে নি। তারপর "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"—সে শোচনীয় দুর্ঘটনার চরম পরিণতি হোল বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ে। চিতোরে, পাণিপথে, হল্‌দিঘাটে, আরাবল্লি গিরিমালার কন্দরে কন্দরে, পলাশীর প্রাঙ্গণে, ভারত তথা বাঙলা তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জনের গৌরবময় কাহিনী রেখে গেছে। রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, বাঙলা প্রভৃতির প্রাচীন ইতিহাসও আছে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে, সৈন্য-বাহিনীকে সংঘবদ্ধ, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সঙ্গীত নানা প্রদেশের নানা ভাষায় রচিত হয়ে থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎকালীন কোন বিবরণই তথ্য সংগ্রহে আমাদের সাহায্য করে না। প্রাচীন বলতে আমরা শুধু জানি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

সেজন্য আমাদের আলোচনা আমাদের সংগৃহীত ও সীমাবদ্ধ উপকরণের উপরই নির্ভর করছে। অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের যে কয়টি

উদাহরণ আমরা উপরে লিপিবদ্ধ করেছি সেগুলি আমাদের মূল আলোচনা—জাতীয় সঙ্গীতের গুণাগুণ বিশ্লেষণের সহায়ক মাত্র এবং যে পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনা আজ সীমাবদ্ধ তা'তে বিদেশীয় উদাহরণের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত তাঁদের জাতীয় সঙ্গীতের কয়েকটি উদাহরণেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে বলে আশা করি।

জাতীয় সঙ্গীতে ভারতবর্ষ ও বাঙলা

একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত সার্বজনীন এবং জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত, কিন্তু আমাদের দেশে অর্থাৎ পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত সর্বভারতীয় ও সর্বসাধারণীয় না হলেও বাঙলা দেশের জাতীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষ এবং অজস্রতার জন্য বাঙালীর গৌরব করার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশ স্বাধীন ছিল না বলেই তার জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে এক মাত্র "বন্দে মাতরম্" ছাড়া আর কোনও গান বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারিত হতে পারেনি—তার ভাষাগত অসুবিধা থাকলেও প্রাদেশিকতার বাধাই মনে হয় প্রবলতর। অন্যান্য প্রদেশের কবিদের মধ্যে ইকবালের একটি সঙ্গীত সর্বজনপরিচিত :—

"সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা।
হম্ বুল বুলে হৈঁ ইস্‌কী বহ বোস্তাঁ হমারা॥"

অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মধ্যে সেরা আমার হিন্দুস্থান। সেই গোলাপ বাগানের আমি বুলবুল—এই গোলাপ বাগান আমারই।

মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডী অভিযানের সময় গুজরাটের দিকে একটি গান খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল :—

"গাঁধিজি গয়া ডাণ্ডী—
সরকার বাঈ হৃয়ে রাঁড়ি
চলো বন্ধু স্বরাজ লেও সহেলসে।"

অর্থাৎ গান্ধীজি ডাণ্ডী গিয়েছেন, ইংরাজ সরকারের পত্নী বিধবা হয়েছে, চলো বন্ধু, অবহেলায় স্বরাজ নাও।

এ ছাড়া হিন্দুস্থানী গানও কিছু কিছু আছে, কিন্তু তার মধ্যে সর্বভারতীয়-ভাবে পরিচিত হয়েছে মাত্র কয়েকটি গান। অন্যান্য প্রদেশের কয়েকটি গান বহু চেষ্টায় "বন্দনা" (১৩৫৪) নামক পুস্তকে সংগৃহীত করা হয়েছে। অন্য প্রদেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও জাতীয় সঙ্গীত বলতে এক মাদ্রাজ ছাড়া আর কোথাও তার কোনও অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না।

তামিল ভাষায় লিখিত অনেকগুলি জাতীয় সঙ্গীত ১৯০৭ সালে প্রচারিত হয়েছিল শুধু তামিল ভাষা-ভাষীদের মধ্যে। সর্বভারতীয় হওয়াতো দূরের কথা, মাদ্রাজ প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা থাকায় সেখানেও সেগুলির প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯০৭ সালের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের কাব্য-সাহিত্যে জন্মভূমির প্রতি অল্পাধিক অনুরাগের লক্ষণ দেখা গেলেও, দেশবাসীর অন্তরে দেশপ্রেম জাগ্রত করবার একমাত্র উদ্দেশ্যে জাতীর সঙ্গীত রচনার কোনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় না তামিল কবিদের মধ্যে।

১৯০৭ সালে কংগ্রেসের মধ্যে যখন চরমপন্থী নেতাদের সমাগমে জাতির রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে বিপুল উন্মাদনার স্বষ্টি হোল তখন থেকেই দক্ষিণ ভারতের সাহিত্যে জাতীয় সঙ্গীত রচনার স্বচনা দেখতে পাওয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় কবি সি, স্থব্রামানিয়া ভারতীকে। তিনি তামিল সাহিত্যে প্রবর্তন করলেন সরল ও সহজ ভাষায় রচিত কবিতা। তিনি ১৯০৭ সালের স্থরাট কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ভগ্নী নিবেদিতার উৎসাহে তাঁর কাব্য-প্রতিভাকে উৎসর্গ করেন জাতীয় সঙ্গীত রচনায়। কবির মৃত্যু হোল ১৯২১ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৮ বৎসর। কিন্তু তিনি এই স্বল্প কালের মধ্যে "জাতীয়" কবিতা ও সঙ্গীতে তামিল সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন। তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর কাল পণ্ডীচারীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে নির্জন বাস করেছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা ও গানে আমরা দেখতে পাই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, তাঁর বাণীতে আমরা পাই আগামী দিনের বন্ধন-মুক্তির আশা ও নিশ্চয়তা। তাঁর ১৯০৮ সালের ভবিষৎ বাণী সফল হয়েছে—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতীয় সঙ্গীত রচনায় দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রচলিত ভাষা তেলেগু, কানারিস্ ও মালয়ালম্ প্রভৃতিতে "জাতীয়" কবিতা ও সঙ্গীত

রচনার কোনও চেষ্টাই এ পর্যন্ত দেখা যায় নি।

বাঙলা দেশের দেহতত্ত্বের গানের মধ্যে, কবির লড়াই, তর্জা গান ও শিবের গাজন গানের (যেমন মালদহের "গম্ভীরা" গান) মধ্যে বহু পুরাকাল থেকেই জাতীয়তা বোধের ছাপ আছে দেখা যায়। কিন্তু "স্বদেশী" যুগ (১৯০৫) থেকেই জাতীয় সঙ্গীতের নিত্য নূতন রচনা এবং পুরাতন সঙ্গীতের নবভাবে প্রবর্তন হতে দেখা গেল। সে যুগে অর্থাৎ "স্বদেশী" যুগে, স্বদেশী গানই একমাত্র প্রাধান্য লাভ করে। সকলের মুখেই তখন শুনা যেত "স্বদেশী" গান। বাঙলার তদানীন্তন লাট কার্জ্জন সাহেবের "বঙ্গ-ভঙ্গ" আদেশের প্রতিবাদে বাঙলাদেশে "স্বদেশী আন্দোলন"এর সৃষ্টি হয়, তখনই বলা যায় বাঙলা দেশের জাতীয় সঙ্গীতের "রেণেসাঁ" (Renaissance) বা নব জাগরণ। ভারতের বাহিরে সুপ্রসিদ্ধ কবি ইক্‌বালের "সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা" ছাড়া অন্য কোনও প্রদেশের কোন সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত বলে প্রচারিত ও সমাদৃত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাঙলাদেশ প্রধানতঃ কবির দেশ, ভাবুকের দেশ, স্বদেশপ্রেমিকের দেশ ; এ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে এবং ক্রমশঃ জনসাধারণের মধ্যে পরাধীনতার গ্লানি ও শাসকের অবিচার ও উৎপীড়নের যন্ত্রণা এমন তীব্র ভাবে অন্তরকে আলোড়িত করেছে, ঘরে ঘরে কারাগারের বন্ধন-বেদনা, অন্তরীণের দীর্ঘশ্বাস, জীবন-বিসর্জনের করুণ কাহিনী এমন ভাবেই সকলকে বিচলিত করেছে যে বাঙলার কবিদের চিত্তকে জাতীয় সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করবার মতো উপযুক্ত প্রেরণার তখন অভাব হয়নি।

আমাদের মনে হয়; যারা স্বাধীন তাদের জাতীয় সঙ্গীতের ভাবধারা, প্রকাশ-ভঙ্গী এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের একমাত্র পৌরুষের দিক ছাড়া অন্য কোনও দিকের মিল থাকতে পারে না। অন্যান্য স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে ভারতবর্ষের মতো অবজ্ঞাত ও উৎপীড়িত জনগণের অপ্রশমিত মর্মবেদনার অনুভূতি নেই ; নিগৃহীত, বঞ্চিত মানবাত্মার আর্তধ্বনি বা বন্ধন-মোচনের তীব্র আকাঙ্খাও নেই, যা' আমরা দেখতে পাই আমেরিকান নিগ্রো কবিদের কবিতা ও গানের মধ্যে অথবা সোভিয়েট দেশের কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে।

কিছুকাল পূর্বে "বিশ্বভারতী পত্রিকা"য় "আমেরিকান নিগ্রো কবিতা" শীর্ষক একটি সুলিখিত প্রবন্ধে লেখক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিগ্রো কাব্য-সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন, তাতে নিগ্রো জাতির পরাধীন দাসজীবনের খানিকটা ছবি আমরা দেখতে পাই। এতে তাদের কাব্যে যে বেদনাময় সুরের সন্ধান পাই, "সে বেদনার সঙ্গে কোথায় যেন আমাদের জন্মান্তরের নাড়ির যোগ আছে, অতি সহজেই তাই এঁদের কাব্য আমাদের হৃদয়ের এত নিকটে এসে পৌঁছায়।" তাদের রচনা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে কি গভীর বেদনার সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে তাদের জাতীয় সঙ্গীত। জাতির বেদনা যেখানে এমনি গভীর ভাবে কাব্যে ফুটে ওঠে, সেখানে সঙ্গীতের সুরে সুরে অগ্নিময়ী বাণীর প্রকাশ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের বেদনার সঙ্গে মিল আছে বলেই এই প্রসঙ্গে এখানে নিগ্রো সঙ্গীতের উল্লেখ করা হল।

পদদলিত জন্মভূমির অপমান ও গ্লানি, নৈরাশ্য ও বিক্ষোভ যে জাতীয় সঙ্গীতে প্রকাশ পাবে এটাই তো স্বাভাবিক—

"মার অপমান বজ্রসমান
বিঁধিয়াছে বুকে তাই,
লাঞ্ছিত এই ভারতবর্ষে
মুক্তির গান গাই"—
(বন্দনা)

এই প্রসঙ্গে নিগ্রো কবি J. W. Johnson এর একটি সঙ্গীত থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায় ঃ—

"This land is ours by right of birth,
This land is ours by right of toil ;
We helped to turn its virgin earth,
Our sweat is in its fruitful soil.
Then should we speak but servile words
Or shall we hang our heads in shame ?
Stand back of new-come foreign hordes
And fear our heritage to claim ?
No ! stand erect and without fear.
And for our foes let this suffice
We've bought a rightful sonship here,
And we've more than paid the price."

কবি বলছেন, জন্মগত অধিকারের দাবীতে এ দেশ আমাদের, শ্রমের দাবীতে দেশের উপর অধিকার আমাদেরই, অকর্ষিত ভূমিতে ঘর্মাক্ত হয়ে শস্য উৎপাদন করেছি আমরা ; তাহলে আমরা কি ক্রীতদাসের মতো কথা কইব অথবা লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে থাকব ? নবাগত বৈদেশিক শোষকের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে থেকে ভয় করব আমাদের বংশ-গত দাবীর কথা ঘোষণা করতে ? কখনই না, আমরা নির্ভয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াব। শত্রুর পক্ষে এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আমরা এই দেশের সন্তান হওয়ার ন্যায্য অধিকার ক্রয় করেছি এবং আমরা তার আসল মূল্যের চাইতে অনেক বেশী দিয়েছি।

বাঙলার জাতীয় সঙ্গীত

আমরা যুগ যুগ ধ'রে নিগ্রোদের মতই দাস-জীবনের গ্লানি ও বিড়ম্বনা ভোগ করে এসেছি। পরাধীনতার নিরুপায় অবস্থা আমাদের মনকে প্রতিনিয়তই বিক্ষুব্ধ করেছে ; অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছি। তার জন্য কারাবরণ করেছি স্বেচ্ছায়, নির্বাসন-দুঃখ ভোগ করেছি সাধকের তিতিক্ষায়, ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণও দিয়েছি আমরা হাসিমুখে—এই আশায় যে একদিন না একদিন দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে মুক্তির উদার আলোকে, এই দুর্ভাগা দেশের নব জাগ্রত জাতির প্রাণে আসবে নূতন প্রেরণা ও শক্তি, নূতন করে দেশকে গড়ে তোলবার কঠোর সঙ্কল্প। আমরা স্বপ্ন দেখেছি স্বাধীন ভারতবর্ষের, কল্পনা করেছি দেশের মাতৃমূর্তির। জন্মভূমি, দেশ জননীর বন্দনায় তাই একদিন ঋষি বঙ্কিমের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—"বন্দে মাতরম্"। আমরা বাঙালী উৎকর্ণ হয়ে সেদিন শুনতে পেলাম আমাদের মাতৃপূজার মন্ত্র-সঙ্গীত—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্!"

* * *

"বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।"

সেদিন সমবেত কণ্ঠে জননী—জন্মভূমির উদ্দেশে আমরা বলে উঠ্‌লাম—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥"

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দে মাতরম্' গানটি তাঁর নিজস্ব স্বর-সংযোজনায় গীত হয়। সেই থেকে এই গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে সারা ভারতে সম্মানলাভ করেছে। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কিয়দংশ বাদ দিয়ে এই গানটি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই "বন্দে মাতরম্" গানখানি নিয়ে এপর্যন্ত অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। অধুনালুপ্ত "বাতায়ন" পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। নিম্নে তার মধ্য থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বলে মনে করি :—

"বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে, একদা আমার ভগিনী (বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা) তাঁহার পিতার নিকট "বন্দে মাতরম্" গানের কথা তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন "একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে এই গান লইয়া বাঙ্গলা উন্মত্ত হইয়াছে— বাঙ্গালী মাতিয়াছে।" বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমি এই গল্পটি আমার ভগিনীর নিকট শুনিয়াছিলাম।"

"একদিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছে—বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথবাবু, নবীনবাবু প্রভৃতি। নবীনবাবু কথায় কথায় আনন্দমঠের সুপরিচিত "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, 'এমন ভাল জিনিষটিকে আধ সংস্কৃত, আধ বাঙ্গলায় লিখিয়া মাটি করা হইয়াছে ; এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না।' বঙ্কিমবাবু ঈষৎ কুপিতস্বরে বলিলেন—'আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে পড়ো

না। আমার ভাল লেগেছে, তাই ওরকম লিখিছি। লোকের ভাল লাগে কি না ভেবে আমি লিখব ?"

"বন্দে মাতরম্" শব্দের অর্থ লইয়া ইংলণ্ডে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলেন, ইহার মর্ম্মার্থ—Hail to thee, Mother" কিংবা "I reverence thee, Mother !" Dr. G. A. Grierson বলেন, "হিন্দুধর্ম্মের কোনও দেবীর উদ্দেশে—সম্ভবতঃ সংহারকর্ত্রী কালীর উদ্দেশে এই গান লিখিত হইয়াছে।" সার হেন্‌রি কটন্ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতটি জননী বঙ্গভূমির আবাহন মাত্র।"

"W. H. Lee এই গানটির যে মর্ম্মানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কটন্ সাহেবের মতের পোষকতা করে। J. D. Anderson লিখিলেন, —"আনন্দমঠের ১ম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যাইতেছে, বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা কালীপ্রতিমার পূজা করিয়া বলিতেছে, মা—যা হইয়াছেন; আর একটি মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমাকে দেখাইয়া বলিতেছে, মা—যা হইবেন ! বন্দে মাতরম্ স্তোত্র এই দুই প্রতিমাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে।"

ব্রিটানিকা বলিয়াছেন,—

"The poem, then, is the work of Hindu idealist who personified Bengal under the form of a purified and spiritualised Kali, * * * lines 10, 11 and 12 are capable of very dangerous meanings in the mouths of unscru pulous agitators. *** During Bankim Chandra's lifetime the *Bande Mataram*, though its dangerous tendency was recognised, was not used as party war-cry ; it was not raised, for instance, during the Ilbert Bill agitation nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendra Nath Banerji in 1883. It has however, obtained an evil notoriety in the agitation that followed the Partition of Bengal. That Bankim Chandra himself foresaw or desired any such use of it, is impossible to believe."

"বাঙ্গালী বেশ জানে, "বন্দে মাতরম্" গানের অর্থ কি ; বাঙ্গালী

জানে, গানের ভিতর বিদ্রোহবহ্নি-ধূম নাই—সংহারকর্ত্রী কালীরও আবাহন নাই ; গানটি জন্মভূমির স্তোত্র মাত্র। জন্মভূমিকে জননীরূপে —আরাধ্যা দেবীরূপে—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সর্ব্বক্ষমতাময়ী প্রকৃতিরূপে কল্পনা করিয়া কবি তাঁহার আহ্বান গাহিতেছেন। কমলাকান্ত যে প্রতিমার পূজা করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সত্যানন্দ সেই প্রতিমার আবাহন গাহিয়াছিলেন। উভয়ের মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক। একজন ডাকিতেছিলেন, "মা" "মা" রবে ; আর একজন গাহিতেছিলেন, "বন্দে মাতরম্"। একজন ভক্তের প্রতিমা—"রত্নমণ্ডিত, দশভুজ—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত।" আর একজন ভক্তের প্রতিমাও তাই—"দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পরাশ্রিত বীর-কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।" একজন বলিতেছেন, "এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব।" আর একজন বলিতেছেন, এই মা যা হইবেন, একজন বলিতেছেন, "এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা।" —আর একজন গাহিতেছেন, "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।" একজন যে হৃদয় লইয়া গাহিতেছেন, "জয় জয় ভক্তি শক্তি দায়িকে." আর একজনের হৃদয়েও সেই সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া শব্দতরঙ্গ উঠিতেছে,—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।"

তাই বলিতেছিলাম, উভয়ের—কমলাকান্ত ও সত্যানন্দের—মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক।

ধ্যানে বা কল্পনায় বা মন্ত্রে দোষ নাই, দোষ—মন্ত্রের অসদ্ব্যবহারে, দোষ—দেশ-কাল-পাত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র কোনও দিন মনে স্থান দেন নাই যে, তাঁহার আরাধ্যা দেবীর পূজার মন্ত্র একদিন নরঘাতী বর্ব্বরের মুখে

ধ্বনিত হইবে ; কিন্তু তিনি ইহা বেশ জানিতেন, একদিন না একদিন "বন্দেমাতরম" মন্ত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গলায় নূতন জীবন আনিবে—নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিবে। কেমন করিয়া জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা জানি না ; তবে দুই একজনের নিকট এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।"

"স্বদেশী" ও "স্বদেশী" গান

সেদিন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর পার হয়ে এসে বাঙালী হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইংরেজের শাসন তখন পাকা হয়ে বসেছে। দেশের মাটিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমির সেদিনকার রূপ-কল্পনা এবং ধ্যান-ধারণার মন্ত্র শোনালেন, বাঙালী সেদিন প্রদোষ অন্ধকারের ধূলি-বিক্ষিপ্ত পথে ভবানন্দ জীবানন্দের পদ-চিহ্ন দেখতে পেলে, দেখতে পেলে শান্তি ও কল্যাণীর কঠোর তপশ্চর্যা। লোক-চক্ষুর বাইরে ঘনবনের অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত হল "আনন্দমঠ"—। আনন্দ-মঠের যুগ কেটে গেলে,—এল দীর্ঘ মৌন ব্যবধান। কিছুকাল চলল আবেদন নিবেদনের পালা,—কিছুকাল চলল—"হোম রূল" বা স্বায়ত্তশাসনের উমেদারী ও তাঁবেদারী। সঙ্গে সঙ্গে এল নিয়মতান্ত্রিক বা উদারনৈতিক দলের "হাঁটি হাঁটি পা পা" করে এগিয়ে চলার ব্যর্থ চেষ্টা। তারপর এল নরম গরম দলের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও কংগ্রেসী আন্দোলন। মাঝখান থেকে বহুকালের বিক্ষোভ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে সারা দেশব্যাপী বিপ্লবের আগুন জেলে দিলে। তারি সমসাময়িক কালে বাঙলা দেশে "স্বদেশী" আন্দোলনের স্থষ্টি হলো "বঙ্গভঙ্গ" আদেশের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া রূপে—১৯০৫ সালের পরই। সেই "স্বদেশী" আন্দোলনের সময় "স্বদেশী সঙ্গীত" রচনায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পেলাম সকলের পুরোভাগে। স্বদেশী আন্দোলনকে অভিনন্দিত করে বাঙালীকে রবীন্দ্রনাথ শুনালেন তাঁর সাবধান-বাণী ;—

"মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা রাজার কোন প্রসাদ বা অপ্রসাদের উপর নির্ভর করে না ; কোন আইন পাশ হউক বা না হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না করুক, আমার স্বদেশ,

আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তান-সন্ততির প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদ্‌দাতা স্বদেশ। কোন মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিব না, কাহারো মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না; একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম। আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি—যে পথ কঠিন, যে পথ কন্টক-সঙ্কুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনো মেঘের গর্জ্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটা যেন ছেলেখেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিও না; দুর্য্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিও না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতি বিবেচকের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্ব্বল করিও না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, বন্যা আসে, তখন সংযত বেশে আসে না কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে। তাহা ভালমন্দ লাভ ক্ষতি দুইই লইয়া আসে। যখন বৃহৎ উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশের চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন সে নিতান্ত শান্ত ভাবে, বিজ্ঞ ভাবে, বিবেচক ভাবে, বিনীত ভাবে, প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণের মত্ততা থাকেই; তাহার বেগ, তাহার দুঃখ, তাহার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে, সেই সমুদ্র-মন্থনের বিষ ও অমৃত, উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।"

স্বদেশী যুগের সূচনায় প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলির অর্থ গ্রহণ করতে পারলে তাঁর স্বদেশী বা জাতীয় সঙ্গীতের প্রেরণা, ভাব, ইঙ্গিত বা বাণীকে আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারব। স্বদেশের মাতৃমূর্তি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে প্রতিভাত হল,—

"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী,
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

ডান্ হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁহাত করে শঙ্কা হরণ।
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র অগ্নি-বরণ।"

সে যুগে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতগুলির মধ্যে, প্রধানতঃ "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক," "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী," "বাংলার মাটি বাংলার জল," "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে," "আমার সোনার বাংলা," "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে," "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে," "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে," "বিধির বিধান কাটবে তুমি এতই শক্তিমান," "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে," "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে," ইত্যাদি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। উত্তরকালে "দেশ দেশ নন্দিত করি" কিম্বা "জনগণমন-অধিনায়ক" গান দু'টি স্বদেশী যুগের গানগুলির মতই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সন ১৮৬৭ সালের "চৈত্র মেলা"য় যে গানটি গাওয়া হয়েছিল সেটির রচয়িতা বাংলার অভিজাত বংশের প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান, রবীন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানটি খুব দীর্ঘ—

"মিলে সব ভারত সন্তান
এক তান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান"। ইত্যাদি

এই "মেলা"র তৃতীয় সম্পাদক, শিল্পি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—

"আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোনও বিশেষ সুখের জন্য নহে, কোনও আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারতভূমির জন্য—যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, বদ্ধমূল হয়—তাহাই এই মেলার উদ্দেশ্য।"

বিপিনবিহারী গুপ্ত তাঁর "পুরাতন প্রসঙ্গ"এ বলেছেন যে জাতীয় মেলার সূচনা থেকেই আমাদের দেশে জাতীয় সঙ্গীত রচনার চেষ্টা দেখা যায়। এই মেলার চতুর্থ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঐ উপলক্ষে একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন—

"মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।

চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি !
এ দুঃখ তোমার হায়রে সহিতে না পারি ।"

রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" অথবা হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত"—"বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে" একই পর্যায়ভুক্ত এবং আগেকার লেখা হ'লেও স্বদেশী যুগেই সেগুলির প্রচার হয় বেশী। সে যুগে আর যে সকল গান মুখে মুখে তখন বাঙলাদেশময় ছড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি—কামিনী ভট্টাচার্যের "অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারী" অথবা,—

"জাগো ওগো কাঙ্গালিনী জননী,
মঙ্গলমন্ত্রে হিন্দু মুসলমান
বিস্মৃত গর্ব্ব ভেদ অভিমান
নব আশা পুলকিত প্রাণ,
দেহি নব শিক্ষা, নব দীক্ষা জননী,
মেলি মুদিত নয়ান।"

অথবা—"সোনার স্বপনমোহে ভুলিওনা ভাই সাধনা" এবং স্বামী প্রজ্ঞানন্দের—

"কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে
এস কে কেঁদেছ নীরবে,
মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।"

মুকুন্দচন্দ্র দাসের "সাবধান, সাবধান, আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্ত্তিমান" এবং "অধিকারী" ভূষণচন্দ্র দাসের—

"আর আমরা পরের মাকে, মা বলে ডাকব না,
জয় জননী জন্মভূমি তোমার চরণ ছাড়বো না।"

অথবা—মুকুন্দ দাসের "আবার বাজিত মোহন বাশরী" প্রভৃতি গানগুলি খুব প্রচলিত ছিল। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল তাঁর একটি তেজোদৃপ্ত গান—

"দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম,
ফিরিঙ্গি বনিকের গৌরব-রবি
অতল তলে ডুবাইতাম।"

• রজনীকান্ত সেনের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই ;" "রে তাঁতি ভাই—একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস্," "আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোট," অথবা "সেথা আমি কি গাহিব গান," এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরই বাংলারে," প্রভৃতি গানগুলিও খুব প্রচলিত হয়েছিল। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের "কত কাল পরে, বল ভারতরে, দুখসাগর সাঁতারি পার হবে," দ্বারকানাথ ঠাকুরের—"না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না," অশ্বিনীকুমার দত্তের "ভোর হল গো, দুর্গা বল গো, উঠ গো বাবুজি," "শ্মশান ত ভাল বাসিস্ মাগো এ" জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের—"চলরে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান" অথবা "একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" এবং সরলা দেবীর "বন্দি তোমায় ভারত জননী, বিদ্যামুকুট-ধারিণী," ও "অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী" ইত্যাদি গানগুলির খুব সমাদর ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের—"ধন ধান্য পুষ্পে ভরা," "আবার তোরা মানুষ হ" "মেবার পাহাড়," "বঙ্গ আমার জননী আমার," "ভারত আমার ভারত আমার," "যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ," "আজিগে তোমার চরণে জননী," প্রভৃতি গানগুলি এবং তাঁর দেশাত্মবোধক নাটকের অনেকগুলি গান জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে এগুলির প্রচলন হয় "স্বদেশী" আন্দোলনের অব্যবহিত পরে। কিন্তু স্বদেশী যুগের সমসাময়িক অথবা তৎপরবর্তী কালের হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের এ গানগুলির প্রচলন আজও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশীয় সুরের সঙ্গে নূতন নূতন বিদেশীয় সুরের সংমিশ্রণ করেছিলেন—গানগুলিকে তখনকার উন্মাদনাময় যুগের উপযোগী করবার জন্য। তাঁর সে চেষ্টা সার্থকই হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের—"উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা" এবং পরবর্তীকালের "বল বল বল সবে শতবীণা বেণুরবে," "আ মরি বাঙলা ভাষা," প্রভৃতি গান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর "মম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী," কাব্য বিশারদের স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি," "ভেইয়া দেশকা এ কিয়া হাল," গানগুলি "স্বদেশী"র দিনে সভায় ও মিছিলে গাইতে শুনা যেত। কাব্যবিশারদের আর একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ গানের কথা আগেই বলেছি :—

"মাগো, যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দেমাতরম্' বলে।"

* * *

"আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে।"

—বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে "বন্দে মাতরম্" বলার জন্য চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার পিঠে অবিরাম পুলিশের লাঠি পড়তে থাকে; তাঁকে যতবার পুকুরে চুবান হয় তিনি ততবারই "বন্দে মাতরম্" বলে ওঠেন। সেকথা আমরা অনেকেই জানি। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই উপরোক্ত গানটি রচিত হয়, এবং তার প্রতিবাদে আর একটি "অজ্ঞাত" লেখকের গানও সেই সময় গাওয়া হোত—

"আমরা গাব সবে বন্দে মাতরম্,
মরলে পরে অমর হব, পাব স্বর্গ অনুপম।"

* * *

"ভেবেছ কি লাঠির ঘায়
মা বলা মোদের ভুলাবি হায়
তোমাদের বে-আইনী হুকুম নাহি মানি
চোখ-রাঙানী ডরাই কম।"

এই "বন্দে মাতরম্" গানটিকে উপলক্ষ করে রচিত আর একটি গান ছিল ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের—

"এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্র এই 'বন্দে মাতরম্
যার বর্ণে বর্ণে তড়িৎ ছুটে।"

এই প্রকার বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, খ্যাত ও অখ্যাত লেখকের লেখা গান সে যুগে প্রচলিত ছিল। প্রমথনাথ দত্তের "ছন্দে ছন্দে নব আনন্দে গাওরে বন্দে মাতরম্" গানটিও স্বদেশী যুগে সকলেই জানতেন।

রামচন্দ্র দাসের সুন্দর এই গানখানিতে বাঙালী চিত্তের উপলব্ধিটি সুন্দর-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে,—

"আমরা সব মায়ের ছেলে
মাকে পেলে কাকে ডরাই"

* *

"আমাদের মা অগ্নিময়ী
মায়ের নামে বিশ্বজয়ী
আমরা সবে মিলে মিশে
দেশে দেশে আগুন ছড়াই।"

এই লেখকের আর একটি গান আছে,—"সোনার ভারত হলরে শ্মশান"।

কবি যতীন্দ্রমোন বাগচীর একটি বাউল গান তখনকার দিনে অনেকের মুখে শোনা যেত—

"ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা।
ওরে মায়ের তরে প্রাণটি দিবার
এমন সুযোগ আর হবে না।"

মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর "মাতৃস্তোত্র" নামের গানটিও বেশ সুপ্রসিদ্ধ ছিল—

"নমো নমো জননী
অশেষ গুণ-ধারিণী
নিত্য-সরসা চিত্তহরষা
রৌদ্র-কনক-বরণি।"

গানটিতে ভাবের খেলার সঙ্গে মাতৃমূর্তির চমৎকার কল্পনা আছে, আর আছে দেবী-পূজার মন্ত্রের ঝঙ্কার।

কবি কামিনী রায়ের "যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন, হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জ্জন," স্বর্ণকুমারী দেবীর "শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম, মায়েরে রাখিব মনে—লয়েছি এ মহাব্রত" প্রভৃতি এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লেখা,—"এ জগতে যদি বাঁচিবি আয়" অপেক্ষা—"আয় আজি আয় মরিবি কে ?"—গানটি তখনকার দিনে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুবিখ্যাত বক্তা ও দেশ-নেতা বিপিনচন্দ্র পালের একখানি গানের কথা আমরা জানি :—

"আর সহেনা সহেনা, সহেনা জননী
এ যাতনা আর সহে না,
মানব-দলনী ত্রিদিবনাশিনী
করাল-কৃপাণী তুমি মা।"

রাইচরণ বিশ্বাসের এই একটি গান তখনকার দিনে বেশ প্রচলিত ছিল—

"একবার জাগো জাগো জাগো
যত ভারত সন্তান রে,
লোহিত বরণে পূরব গগনে
উদিত তরুণ তপন রে।"

এই লেখকের আর কোনও গানের সন্ধান পাওয়া যায় না। শুনেছি, তিনি পল্লীবাসী। এমনি আরও কয়েকজন পল্লীবাসী জাতীয়-সঙ্গীত-রচয়িতাকে আমরা পেয়েছিলাম স্বদেশী যুগে। যেমন শশিকান্ত,—এঁর কি উপাধি তাও ভাল জানা নেই, তবে তিনি নিজেকে "দ্বিজ" বলে পরিচয় দিয়েছেন নিজের গানে। তাঁর একটি "সারি গান" তখন প্রচলিত ছিল—

"জাগো ভারতবাসীরে, কত ঘুমে রবেরে
বলো সবে হয়ে একমন বন্দে মাতরম্।"

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

"আজি বিশ্বে কারেও করিনাক ভয়,
ভয়েরে করেছি জয়।"

—গানখানি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

আর একজনের নাম দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর গানের মধ্যে দ্বিজ শশিকান্তের গানের মতো হিন্দুমুসলমান-মিলনের আহ্বান আছে—

"হিন্দু মুসলমান, হয়ে এক প্রাণ,
এস পূজি মার চরণ দু'খানি।"

স্বদেশী ব্রত গ্রহণের উপদেশ ও দেশের দুর্দশার কথাও এই দীর্ঘ গানটিতে পাওয়া যায়। মনোরঞ্জন রায়ের "উন্নতি উন্নতি উল্লাস ভারতী" গানটিও তখনকার দিনে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ইনিও ছিলেন জনগণের কবি। তাঁর দেশবাসী সম্পর্কে শ্লেষসূচক একটি গানের প্রথম চরণ—

"চিনির বলদ তোমরা কেবল,
কেরাণী মুহুরী সরকারের দল।"

আর একজন কবি ছিলেন সুরেন্দ্র ভৌমিক। তিনি লিখেছিলেন—

"মন্দ কুসুমগন্ধ বহন পবন হিল্লোলে
গরিমাময়ী মা, তোমারি যশোমালিকা গলে।"

এ ছাড়া অজ্ঞাত লেখকের লেখা—

"রাম রহিম নাম জুদা কর ভাই
মনটা সাচ্চা রাখোজি"

অথবা—

"মেরা সোনেকা হিন্দুস্থান
তু হামারা দিলকী রোশনী
তু হামারা জান।"

আর একটি গানেরও বিশেষ প্রচলন ছিল। গানটি ব্যাণ্ডের সুরে গাওয়া হোত—

"চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে তোরা
জীবন আহবে চল্‌
চল্‌ চল্‌ চল্‌।

বাংলা দেশের গৌরব, অগ্নিযুগের নির্ভীক সাধক দেবব্রত বসুর "আমায় দে মা অসি" গানখানিও তখন গাওয়া হোত। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর কোন এক অজ্ঞাত পল্লী কবির লেখা—

"এবার বিদায় দাও মা ফিরে আসি,
আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে
ভারতবাসী।"

—গানখানি বাঙলা দেশের কৃষক ও রাখাল থেকে আরম্ভ করে' সকলের মুখে মুখে শোনা যেত এবং ভিখারীরাও তখন পল্লীতে পল্লীতে, সহরে সহরে, হাটে বাজারে, রেলগাড়ীতে গেয়ে বেড়িয়েছে। অজ্ঞাত লেখকের আর একটি গানও মিছিলে বা সভার প্রাক্কালে তখন গাওয়া হোত—

"উঠ্‌রে উঠ্‌রে উঠ্‌রে তোরা
হিন্দু-মুসলমান সকলে ভাই
বাজিছে বিষাণ উড়িছে নিশান,
আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই।'

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে "বন্দেমাতরম্‌ গাওরে ভাই" বলে সকলকে

আহ্বান জানিয়ে বহু গান তখনকার দিনে রচিত হয়েছিল। তার প্রধান কারণ মনে হয় এই যে, স্বদেশী ব্রত বা স্বরাজ সাধনার মন্ত্র বলেই তখন "বন্দে মাতরম্"কে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তখনকার দিনের কর্মীদের বিশ্বাস ছিল যে এই মন্ত্রবলে ভারতবর্ষের কোটি কোটি সন্তান মিলিত হবে একযোগে, এক প্রাণে। স্বদেশী গানে যেমন দেখি হিন্দু মুসলমানের একতার আহ্বান তেমনই দেখি স্বদেশ-উদ্ধার সাধনের মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। "বন্দে মাতরম্" আনন্দমঠের কালে রচিত হলেও তার প্রচার হয় বিশেষভাবে স্বদেশী যুগে ; কিন্তু দেবীর রূপ বর্ণনা ও প্রার্থনার দিক থেকে বিবেচিত হওয়ার দরুণ হিন্দু ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের কাছে তার যথেষ্ট সমাদর হয়নি, কিন্তু এ গান সর্বসম্প্রদায়ের সমবেত কণ্ঠে গীত না হলেও, "বন্দে মাতরম্' কথাটিকে 'জয়-ধ্বনি' হিসেবে গ্রহণ করেছিল সকলে সম্প্রদায় নির্বিশেষে, জাতীয়তাবাদী প্রত্যেক বাঙালী এবং অধিকাংশ ভারতবাসী।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে বন্যার স্রোত নিয়ে এসেছিলেন তাঁর গানে। "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" থেকে আরম্ভ করে অবিরাম তিনি লিখেছেন অজস্র দেশাত্মবোধক গান। ভাবে, ভাষায় ও ঝঙ্কারে, সুরের বৈচিত্র্যে, ও অনুভূতির মাধুর্যে সে গানগুলি চিরদিন বাঙলার জাতীয় সম্পদ হয়েই থাকবে, সেগুলি যেন বঙ্গবাণীর কণ্ঠহারের এক একটি মহামূল্য রত্ন বিশেষ।

রবীন্দ্রনাথের তিনটি জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর নিজের লেখা নিম্নের চিঠিখানি বিশেষভাবে তথ্যমূলক—*

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

জনগণমন-অধিনায়ক গানটি কোন উপলক্ষ্যে কিংবা নিরপেক্ষভাবে আমি লিখেছি কি না তুমি জিজ্ঞাসা করেছ।

একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল

---

* 'ভুবনমনোমোহিনী' ও "জনগন-মন-অধিনায়ক" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য। সাহিত্যিক শ্রীঅবনীনাথ রায়ের নিকট শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের চিঠির নকল হতে গৃহীত।

মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে বিশেষভাবে দুর্গামূর্ত্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিলিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্ত্তিত করবেন। তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনামিশ্রিত স্তরের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম, এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না, সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রের অধিকারগত হ'ত, তাহলে আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস যাই হোক্ আমার পক্ষে তাতে সংকোচের কারণ থাকত না,—কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে পূজার ক্ষেত্রে কৃত্রিম অর্ঘ নিয়ে অনধিকার প্রবেশ গর্হণীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হননি, এর পরিবর্ত্তে রচনা করে ছিলুম ভুবনমনোমোহিনী, এ গান পূজা-মণ্ডপের যোগ্য নয় সে কথা বলা বাহুল্য। অপরপক্ষে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এ গান সার্ব্বজনীন ভারত রাষ্ট্রসভায় গা'বার উপযুক্ত নয়, কেন না এ কবিতাটি একান্তভাবেই হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্ম্মঙ্গম হবে না।

আমার ভাগ্যে অনুরূপ ঘটনা আর একবার ঘটেছে। সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোন বন্ধু, সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম; সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্য্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগ-যুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ কোন জর্জ্জই কোনক্রমেই হতে পারে না, সে কথা রাজভক্ত বন্ধু অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না। এ গান বিশেষভাবে কংগ্রেসের জন্য লিখিত হয় নি।

এই প্রসঙ্গে আর একদিনের কথা মনে পড়ছে, সে বহুদিনের পূর্ব্বের কথা। তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল রাজপ্রাসাদের দুর্গম উচ্চশিখর থেকে প্রসাদকণা বর্ষণের প্রত্যাশায়। কোনো এক সভায় তাঁদের সান্ধ্যসম্মেলনের উদ্যোগ হচ্ছিল। আমার কাছে তাঁদের যে দূত এলেন তিনি আমার এক অপরিচিত ব্যক্তি। আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে না। শেষ পর্য্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। যেতে হল। ঠিক যাবার পূর্ব্বক্ষণেই আমি নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনা করেছিলুম।

আমায় বলো না গাহিতে বলো না
এ কি শুধু হাসিখেলা. প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা ॥
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম বেদনা।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা ॥

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে,
মিছে কাজে নিশিযাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা ॥

এই গান গাবার পর আসর জমল না। সভাসদগণ খুশি হন নি। বার বার ঘা খেয়ে এটা বুঝতে পেরেছি যে আকাশের গতিক দেখে চলতি

হাওয়ার অনুসরণ করতে পারলে জনসাধারণের খুশির পথ অতি সহজেই মেলে, কিন্তু সকল সময় সেটা শ্রেয়ের পথ হয় না, এমন কি কবির পক্ষেও সেটা আত্মাবমাননার পথ। এই উপলক্ষ্যে ভগবান মনুর একটি উপদেশ স্মরণ করি যাতে তিনি বলেছেন, সম্মানকে বিষের মতো জানবে, অমৃত বলে গণ্য করবে নিন্দাকে। ইতি ২০।১১।৩৭

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর আবেদন

জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার উপলব্ধি নিয়ে এই জাতীয় সঙ্গীতগুলি রচিত হয়েছিল—সেগুলির আবেদন ছিল প্রত্যক্ষ ও সহজবোধ্য ; তাই সেগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সংখ্যা যে বেশি নয় তার কারণ পরবশ্যতার গ্লানি ও দুঃখ সেখানে জাতির জীবনে সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পকালস্থায়ী, আমাদের দেশের মতো নিরবচ্ছিন্ন নয়। আমরা তখন অজস্র সঙ্গীতে দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলাম ; আমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা হয়েছিল জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। যাহোক, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় বলে মনে করি।

প্রথমতঃ অধিকাংশ গানের মতোই আমরা দেখতে পাই গীতিকার দেশকে, জন্মভূমিকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করেছেন।

গীতিকারগণ সকলেই প্রায় হিন্দু, হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁদের জন্ম—সেইভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা বেড়ে উঠেছেন—হিন্দুধর্মের দেবদেবীর কল্পনাকে আশ্রয় করে। তাই তাঁরা সেইভাবে জননী জন্মভূমি, মাতৃভূমি বা দেশমাতার রূপ বর্ণনা করেছেন। পূজার যে মন্ত্রে আমরা আমাদের শক্তিময়ী মাতৃরূপিণী দেবী দুর্গা বা কালীর পূজা করি, তারই বিশিষ্ট প্রভাব যে জাতীয় সঙ্গীতে মাতৃভূমির রূপায়ণ ও আরাধনার মন্ত্রে অভিব্যক্ত হবে এটা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কয়েকটি গান ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতৃমূর্তি কল্পনার মধ্যে ধর্মের বাঁধাধরা রীতি নেই—গোঁড়ামিও নেই। পরপদানত

জাতির শৃঙ্খলিতা বন্দিনী মায়ের যে কল্পনা সে কল্পনা তো হিন্দুমুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়েরই কল্পনা। যে বেদনার মন্ত্রে তাঁর ধ্যান ও আরাধনা—তাতে কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মবুদ্ধি আহত হতে পারে না। সমগ্র জাতির অন্তরের গভীর বেদনায় যার উৎপত্তি তার আবেদনও স্বভাবতঃই সার্বজনীন। তবু যে সারা ভারতের মধ্যে এ সকল গানের প্রতিষ্ঠা হয়নি তার প্রধান কারণ ভাষার বৈষম্য। তাছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণা সর্বভারতীয় ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ—বাংলা দেশের সে আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা ছিল কতকটা নেতৃত্বের পর্যায়ে—সাধারণ্যে পৌছানর জন্যই অনেক স্বদেশী বা জাতীয় সঙ্গীতে তাই আবেদনের সুর শুনতে পাওয়া যায়। দেশপ্রেমিক মৌলভি লিয়াকৎ হোসেন ছিলেন একজন সর্বত্যাগী মুসলমান নেতা—মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে তাঁকে কর্মব্যস্ত থাকতে অনেকেই দেখে থাকবেন। আর মনে পড়ে মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলভি ফজলুল হক, মুজিবর রহমান ও আবদুল গণিকে—এঁরা সকলেই ছিলেন "স্বদেশী" আমলে নেতৃস্থানীয়।

হিন্দু মুসলমান যে একই মায়ের সন্তান, একই আকাশের তলে তাদের জন্ম, একই বাতাসে তারা উভয়ে নিঃশ্বাসগ্রহণ করে, একই মাটিতে উৎপন্ন শস্যে তারা জীবনধারণ করে, একই জলে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করে—এই ভাবকে জাগিয়ে তোলবার জন্য অনেক জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছিল।

মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ কেউ জাতীয় সঙ্গীত 'হিন্দুধর্ম ঘেঁষা' ব'লে কিছুটা আপত্তি জানালে—তাদের বোঝান হত যে, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি কল্পনার পিছনে আছে একটা প্রচ্ছন্ন রূপক। কোনও ধর্ম-সংস্কারই তাতে আঘাত পেতে পারে না। দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা মূর্তির মধ্যে শক্তি-সাধনার রূপক আছে। বিদ্যা, ধন, শৌর্য, বীর্য, সিদ্ধি মানুষের এই পঞ্চবিধ শক্তির উৎসকে আশ্রয় করেই এরূপ মূর্তির কল্পনা। সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ এবং স্বয়ং ভগবতী যথাক্রমে এই শক্তিরই প্রতিভূ। কাজেই রূপকের ইঙ্গিতকে উদার মনোভাব নিয়ে বিচার করলে—মাতৃরূপে জন্মভূমির কল্পনাকে অবান্তর বলা যায় না। যে 'বন্দেমাতরম' নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে,

হয়ত কিছু বিভেদেরও সৃষ্টি হয়েছে, তার গোড়ার কথাও ঐ রূপক। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' বলে' যে জননীর বন্দনা করলেন—তিনি বঙ্গমাতা, আবার তিনিই বাণী, লক্ষ্মী ও শক্তিরূপিণী দুর্গা—তিনি সুজলা সুফলা, শুভদা বরদা, আবার দশপ্রহরণধারিণী, বাণী কমলদল-বিহারিণী। দেশীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের সঙ্গে দেশাত্মবোধের সংযোগ ঘটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেবীর জন্মান্তর সাধন করলেন—এই হলো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। এর মধ্যে আছেন আমাদের দেশমাতা, আবার আছেন সর্বশক্তির আধারময়ী দেবতা। সাহিত্য বা কাব্যের মধ্য দিয়ে আমরা ইতিপূর্বে এমনভাবে দেশকে কোনওদিন দেখিনি, দেখতে পাইনি—দেশমাতা এখানে দেবীত্বের মহামহিমায় আবির্ভূতা।

তৃতীয়তঃ—এই সকল জাতীয় সঙ্গীতে বাংলাদেশের বর্ণনা, তার সংস্কৃতি ও মর্মকথা বিশেষভাবে প্রকাশ পেলেও অধিকাংশ সঙ্গীতেই নিখিল ভারতের সমষ্টিগত ঐক্য উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায়। যে আন্দোলনের সূচনা হল দেশের অন্তর থেকে, সে আন্দোলনের মধ্যে বাঙালী কবি, বাঙালী গীতিকার, বাঙালী নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের সমগ্র রূপেরই কল্পনা করেছেন—সারা ভারতের ভাবধারণার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে। সর্ব ভারতীয় নব জাগরণেরই কল্পনা তাঁরা করেছিলেন। পুণ্যভূমি ভারতের পরাধীনতার গ্লানি বাঙালীকে সেদিন উন্মাদ করে তুলেছিল। তাই বাঙালী সেদিন বাংলা দেশের মধ্যেই মাতৃভূমির কল্পনাকে সীমাবদ্ধ রাখেনি—তার মানসনেত্রে সেদিন ভারতবর্ষের সমগ্র রূপটিই প্রতিভাত হয়েছিল—অন্তরের নিভৃত কন্দরে বাঙালী সেদিন সেই দেশমাতারই পূজার অর্ঘ সাজিয়েছিল—তার শোভাবর্ধন করেছিল—সারা ভারতেরই পূজা-উপচার আহরণ ক'রে।

অসহযোগ আন্দোলনের যুগ

১৯২১ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের যুগ আরম্ভ হয়। এযুগে জাতীয় সাহিত্য যে আশানুরূপ গড়ে ওঠেনি এ ধারণা আংশিক ভাবে সত্য। ১৯২১ সালের পরই নজরুল ইস্‌লামের "বিষের বাঁশী", বর্তমান লেখকের "রক্তরেখা", বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "সর্বহারার গান" এবং সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত একাধিক বই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ('Proscribed as

seditious literature') হয়। ১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট কাকোরী স্টেশনে অনুষ্ঠিত বৈপ্লবিক ডাকাতির অভিযোগে রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রোশন সিং, আসফাক উল্লা ও রামপ্রসাদ বিস্মিলের ফাঁসি হয়। আসফাক উল্লা ফাঁসির আগে এই গানটি রচনা করেন—

"ফণা হ্যায় সবকা লিয়ে
হাম পার কুছ নেহি মৌকুফ
বকা হ্যায় এক যাকত
জাতে কিব্রিয়াকে লিয়ে।
তঙ্গ আকর হামভী
উনকে জুলুমসে বে-দাদসে
চল দিয়ে সুয়ে আদম
জিন্দাঈ কয়জা বাদসে।"

রামপ্রসাদও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এই গানটি লিখে যান—

"যদি দেশহিতমে মরণা পড়ে
মুঝকো সহস্রবার ভী
তোভী ন ম্যায় ইস কষ্টোকো
নিজ ধ্যানমে লাঁউ কভি।
হে ঈশ, ভারতবর্ষমে
শতবার মোর জন্ম হো,
কারণ সদা হো মৃত্যুকা
দেশোপকারক কর্ম হো।
মরতে "বিস্মিল" "রোশন" "লাহিড়ী"
"আস্‌ফাক" অত্যাচারমে
হোঙ্গে পয়দা শওক্রো:হী
উনকো রুধিরকো ধারসে।
উনকো প্রবল উদ্যোগসে
উদ্ধার হোগা দেশকা
তব্ নাশ হোগা সর্ব্বথা
দুঃখ শোককে সব লেশকা।"

পরবর্তীকালের সাময়িক পত্রে জাতীয় সাহিত্য রচনার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়—প্রবন্ধে ও কবিতায়। প্রেস আইন ও "সিডিসন" আইনের

জন্য অনেক কবিতা পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করেনি। আজ আমাদের দেশে পাঠকের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়েছে। তখনকার দিনে সাধারণ লোকে এই ধরণের বই কাছে রাখতে ভয় পেত। যাহোক, এ সময়েও নজরুলের—"দুর্গমগিরি কান্তারমরু", "চল চল চল", "এই শিকলপরা ছল", "জাতের নামে বজ্জাতি"—প্রভৃতি বহু গান বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একথা পূর্বেও বলেছি। বর্তমান লেখকের "যারা যুগ যুগ ধরি তুলিয়াছে ভরি মায়ের পূজার ডালা"—১৩৩৮ সালের ১০ই আশ্বিন, দেশবন্ধু পার্কে প্রথম "নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন"এ পতাকা উত্তোলন উৎসবে শতাধিক ছাত্র ছাত্রীর সমবেত কণ্ঠে গীত হয়েছিল। গানখানিতে সুরসংযোগ করেছিলেন নজরুল ইসলাম—তাঁর সহকারী ছিলেন প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী উমাপদ ভট্টাচার্য। মাদ্রাজের কংগ্রেস নেতা শম্ভোমূর্তি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সে যুগে বহু রাজনৈতিক সভা ও সম্মেলনের উদ্বোধনপর্বে গানখানি গাইতে শোনা যেত।

তারপর বহু দিন কেটে গেছে। ১৯৪২ সালের কিছু কাল পরেই—"প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে"র উদ্যোগে যে কয়খানি নাটক রচিত হয়েছিল—তার গানগুলিতে জাতীয়তাবোধের আভাস থাকলেও সেগুলির আবেদন সর্বত্র দেশমুখী ছিলনা—'জনগণের জন্য লিখিত' হলেও বিশেষ একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সেগুলি সর্বসাধারণের কাছে স্বীকৃতি পায়নি।

১৫ই আগষ্টের পর

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট, ২৯শে শ্রাবণ শুক্রবার, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে; সেজন্য এই দিবসটি জাতির জীবনে "পুণ্যাহ" বলে আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। জাতির একান্ত প্রাপ্য জন্মগত অধিকার সেদিন স্বাধীনতালাভে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। সেদিন প্রভাতের প্রথম আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করলাম—

"পূর্ব গগনে উদিল সূর্য নূতন দিনের আশা
তাহারি আলোকে ফুটিয়া উঠিছে রুদ্ধ মনেরই ভাষা।"

কে যেন একান্ত আত্মীয়ের মতো কানে কানে আশার বাণী শুনিয়ে গেল—

"বন্ধন নাহি ওরে বন্ধন
বন্দীর অপমান, নিঃশেষে অবসান

ঘুচিয়াছে নিষ্ফল ক্রন্দন ;
দ্বারে এল আহ্বান মুক্তির কলগান
নির্ভয়ে চল অভিযাত্রী।"

(বন্দনা)

যাত্রারম্ভে আমাদের পথ ছিল দুর্গম, সুদীর্ঘ ও কণ্টকসমাকীর্ণ ; আমাদের পাথেয় ছিল সামান্য, কিন্তু মহৎ আদর্শের প্রেরণা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা—ছিল আমাদের সম্বল। স্বাধীনতা লাভের জন্য যথাযোগ্য মূল্য দিতে হয় তা আমরা জানি ; তাই যাদের আত্মত্যাগের পুণ্যে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি ১৮৫৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত সে মূল্য দিতে তারা কোনওদিনই কুণ্ঠিত হয় নি। তারা নিঃসংশয়ে প্রাণ দিয়েছে, দ্বিধাহীন চিত্তে নির্যাতন সহ্য করেছে ; অপমানে অবিচারে, অত্যাচারে তাদের সংকল্প থেকে তারা এক পাও পিছিয়ে যায়নি। তারা হেলায় কারাবরণ করেছে, হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেছে নির্ভয়ে—তারা অভয়া মায়ের সন্তান, তারা অন্তরীণে দিনের পর দিন পচে মরেছে, নির্বাসনের কঠোর দণ্ড ভোগ করেছে মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির জন্য—তবুও মাতৃমন্ত্র তারা ভুলে যায়নি, দারিদ্র্যে দুঃখে ও মর্মবেদনায় তাদের সংকল্প হয়েছে দৃঢ়তর—নির্ভয়ে বুক পেতে দিয়েছে তারা উদ্যত অস্ত্রের সম্মুখে। তাদের প্রাণে দুর্দমনীয় আকাঙ্খা জাগাতে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কম প্রেরণা দেয়নি।

আমরা দেখতে পেলাম—

"তাদেরই পুণ্যে ধন্য হয়েছে দেশ
তাদেরই রক্তে ধুয়ে মুছে আজ
দাস-জীবনের কলঙ্ক নিঃশেষ।"

১৫ই আগষ্টের দেশব্যাপী ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উৎসবে আবার শুনতে পেলাম—"বন্দেমাতরম্"— শুনতে পেলাম—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দৃপ্ত কণ্ঠের আহ্বান—"জয় হিন্দ" দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হাস্যকলরব মুখরিত জনতার চাঞ্চল্যের মধ্যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধনায় দেশবাসীর আকুল আবেদনের মধ্যে আমরা অনুভব করলাম—

"জাগে নব ভারতের জনতা
একপ্রাণ একজাতি একতা।"

চারণের দল সেদিন পথে পথে গেয়ে গেল—

"বন্দীশালার ঘুমন্ত বন্দীরা জাগরে
দিগন্তে মুক্তির দুরন্ত উষা দিল ডাক্‌রে
ঘুমন্ত জাগরে।
যদি শৃঙ্খল গেল আজি টুটিয়া
যদি রক্তের স্রোতে ওঠে স্বাধীনতা-শতদল
ফুটিয়া
তবে আয়রে
লগ্ন যে বয়ে যায় হায় রে।"
(অশোককুমার)

সমস্ত জাতি জেগে উঠল সেদিন নব উন্মাদনায়; জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর শান্তি ও ঐক্যের বাণী সফল হল—

"পুণ্য হইল ভারতধাম,
ধন্য হইল গান্ধী নাম
অসহযোগী যোগী নমঃ
সত্যাগ্রহী লহ প্রণাম"
(সজনীকান্ত)

সেই আনন্দের দিনে দেশের কবি স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মরণ করতে ভুলে যাননি, তিনি ক্ষুদিরামকে উদ্দেশ করে বলছেন—

"দেশের বক্ষে রক্ত আখরে
রেখে গেছ নিজ নাম"—

* * *

দেশের মুক্তি এসেছে দুয়ারে
তুমি নাই তুমি নাই
তব বিচ্ছেদ ব্যথায় কাঁদিছে
কোটি কোটি বোন ভাই।
অদূরে ঝলকে স্বরাজ-সূর্য
বাজিছে নিকটে বিজয়-তূর্য
বন্দরে এল জাহাজ এবার
পূর্ণ মনস্কাম,

তোমাদের প্রাণ-অর্ঘে ভারত
হয়েছে পুণ্যধাম।"

(গোপাল ভৌমিক)

এইভাবে ১৫ই আগষ্টের শুভ উদ্বোধনে রচিত হল একাধিক সঙ্গীত কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয় যে, আমরা যে প্রাণ-প্রবাহে সেদিন অবগাহন স্নান করে উঠলাম – জীবনে নূতন প্রেরণার অভিনব স্পন্দন অনুভব করলাম, সেই তুলনায় অধুনা রচিত জাতীয় সঙ্গীত ও কবিতা সংখ্যাতে, কাব্য-সম্পদে, অনুপ্রেরণা ও আবেদনে বাংলা সাহিত্যকে আশানুরূপ সমৃদ্ধ করতে পারেনি। কিন্তু নিরাশ হওয়ার কারণ এখনো ঘটেনি—কারণ বর্তমানের নবপ্রচেষ্টার ধারা যখন তার স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হবে—আমাদের অধিষ্ঠান ভূমিতে তার অভিসিঞ্চন যখন নূতন ফসল ফলবার আশাকে জাগিয়ে তুলবে—অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান ইতিহাসের সমন্বয় ঘটবে, তখন আবার আমরা নূতনতর জাতীয় সঙ্গীত ও কাব্যের আস্বাদ উপভোগ করতে পারব।

একথা বলাই বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী জাতীয় সঙ্গীত ও কবিতা আমাদের নবযাত্রার পথকে তার চিরন্তন অম্লান আলোকে উদ্‌ভাসিত করে রেখেছে। তাঁরই অনুপ্রেরণায় দেশকে নূতন করে ভালবাসতে শিখব, ভক্তিনম্র চিত্তে বলতে পারব—

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।

(রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন—"মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে—এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।" ইতিহাসের আত্মপ্রকাশ আরম্ভ হয়েছে—

আমরা "স্বরাজ" লাভ করেছি কিন্তু এখনও আমরা চিত্তের স্বারাজ্য লাভ করতে পারিনি—তাই কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশাত্মবোধের নবতন উদ্বোধনের প্রয়োজন আছে। এ যুগে চাই নূতন নূতন কবির বীণায় নিত্য নূতন ঝঙ্কার, নূতন নূতন গীতিকারের লেখনীতে চাই স্বাধীন দেশবাসীকে "শুভ কর্মপথে" আহ্বান করার মতো অজস্র সঙ্গীত—ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে ও মূর্ছনায়, আবেদন ও আকর্ষণে তার মধ্যে প্রকাশিত হবে—নবযুগের নূতন আশার বাণী; রাগিণীতে জাগবে নব সূর্যের অভ্যর্থনা, সুরে থাকবে নব প্রভাতের উন্মাদনা! "সেই মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে" বাংলা দেশের জাতীয় সঙ্গীত তার মর্মস্পর্শী আবেদন বহন করে চলবে সারা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে—নবজাগ্রত জাতিকে বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর করে নিয়ে যাবে তার চিরবাঞ্ছিত ধ্রুব লক্ষ্যের দিকে—

"উদয়ের পথে শুনি তার বাণী—
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"
(রবীন্দ্রনাথ)

বাহুল্য হলেও পরিশেষে এ কথা বলে রাখা দরকার যে আমাদের পূর্বাপর আলোচনায় কবি বা গীতিকারদের রচনার মধ্য থেকে শুধু অংশ মাত্রই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শেষ ফর্মা ছাপা হতে যাচ্ছে—এমন সময় শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সদ্য-প্রকাশিত "ছন্দ ও গীতি" বইখানি হাতে এসে পড়ল। তার মধ্যে অনেকগুলি "স্বদেশী" গান আছে। সেগুলি অকৃত্রিম দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত—"মুক্ত ভারতে" "নবজীবনের ইঙ্গিত"এ পূর্ণ "মিলনের সঙ্গীত।"—প্রাসঙ্গিক বলেই এখানে তার উল্লেখ করা হল।

সমাপিকা

বর্তমান খণ্ডে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মূলগত আদর্শ, প্রেরণা ও ক্রম-পরিণতির যে আলোচনা করা হল,—সামগ্রিক ভাবে সেটি পরবর্তী দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট কাব্য-তত্ত্ব ও কবি-কর্মের বিশদ আলোচনার পটভূমি।

বাংলা সাহিত্যের স্থিতি-ভূমিতেই বাংলা কাব্য প্রতিষ্ঠিত, সেখানে প্রাচীন অর্বাচীনের কোনও প্রশ্ন ওঠে না,—উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কোনও দাঁড়ি টেনে দেওয়াও সম্ভব নয়। সাহিত্য-বিচারের আদর্শ ও রীতিসম্মত মানের দ্বারাই কাব্যেরও বিচার হয়ে থাকে ; কাব্য-তত্ত্বের উপলব্ধি সেখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুস্যূত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্যের স্থান অবশ্য একদিক থেকে অনেক উঁচুতে এবং তাতে সাহিত্যের সত্য স্বরূপই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। প্রথম খণ্ডে সাহিত্যের যে আলোচনা করা হয়েছে কাব্য সম্পর্কেও তা' যথাযথ ভাবে প্রযোজ্য।

সাহিত্যের সামগ্রিক রূপায়ণের মধ্যেই কাব্যের আত্মপ্রকাশ। এই আত্মপ্রকাশ কি ভাবে ঘটেছে আমরা এ পর্যন্ত তার মোটামুটি আলোচনা করেছি।

"কাব্য-সাহিত্যের ধারা"র দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলা কাব্যের আদর্শ. রূপ ও রীতি এবং সেই সঙ্গে আধুনিক কাব্যের গতি প্রকৃতির আলোচনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের প্রধান প্রধান অধ্যায়গুলির নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'ল :—

(১) বাংলা কাব্যে নবযুগ– মাইকেল মধুসূদন (২) রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩) আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যে ভাব-বিপর্যয় (৪) বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা (৫) কাব্য ও কবি (৬) কাব্য-সৃষ্টির উদ্দীপনা (৭) কাব্য ও আর্ট (৮) ছন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য (৯) আধুনিক বাংলা কাব্যের পটভূমি (১০) আধুনিক-বাংলা কাব্যের গতি ও প্রকৃতি (১১) কাব্য ও আধুনিক কাব্য (১২) প্রাসঙ্গিক অভিমত।

দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে আছে ; আমরা আশা করি, আগামী পূজার পূর্বেই সেখানি প্রকাশিত হবে।